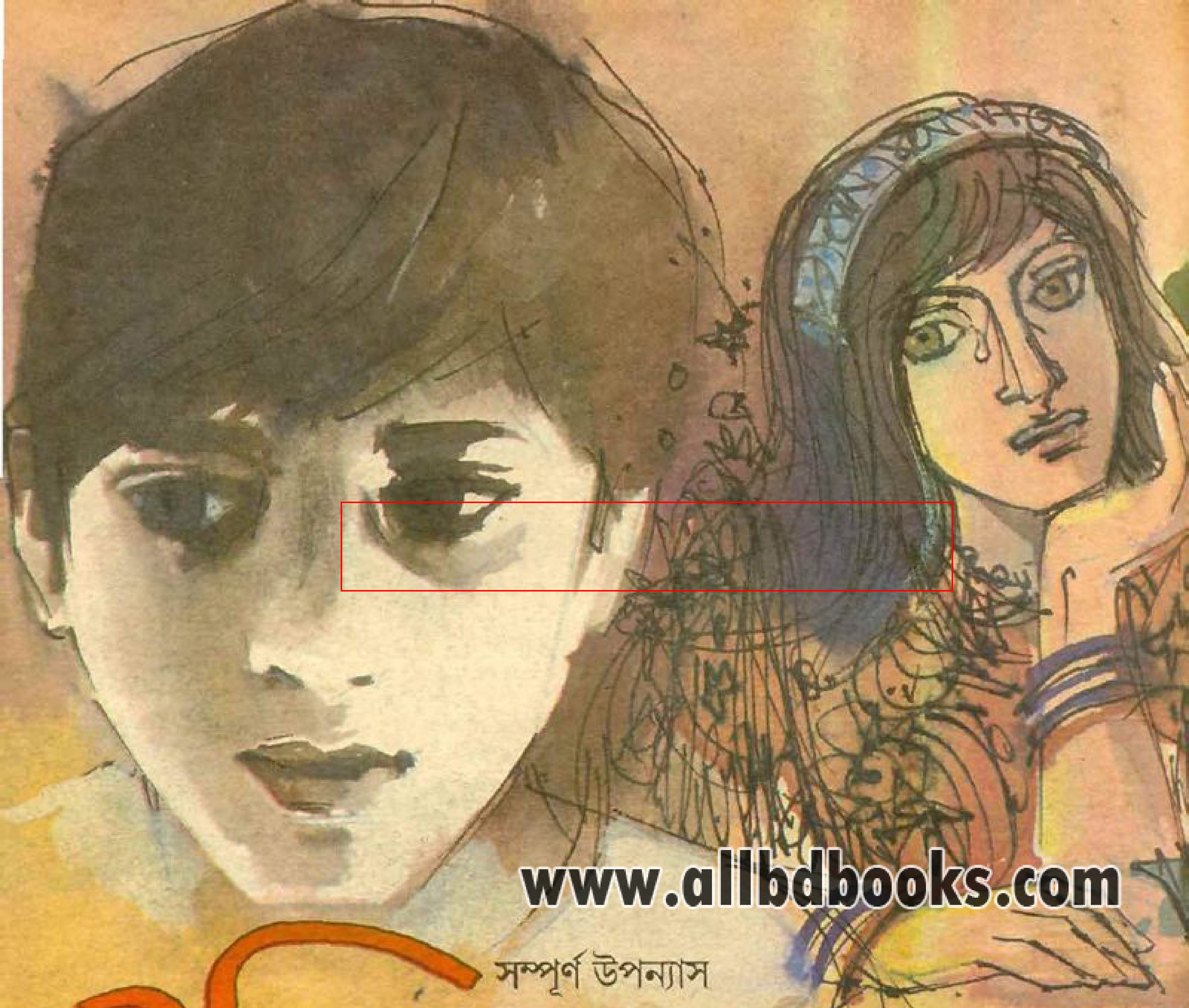

www.allbdbooks.com

সম্পূর্ণ উপন্যাস

ইতি পলাশ

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

"আমি পারব না বাবা। আমি কিছুতেই পারব না।"

"পারতে তোমাকে হবে। ধীরে-ধীরে, এক পা এক পা করে এগিয়ে এসো। প্রথমে ডান পা, তারপরে বাঁ পা, চেষ্টা করো, চেষ্টা করো। এই তো আমি দু'হাত বাড়িয়ে রেখেছি তোমাকে ধরে নেব বলে। ভয় পাচ্ছ কেন? আমি তোমাকে সাহস দিচ্ছি।"

"আমি পারছি না বাবা। ভীষণ লাগছে। আমার পা কাঁপছে।"

খাটের বাজু ধরে পলাশ দাঁড়িয়ে আছে। কোনওরকমে। তার পা থরথর করে কাঁপছে। মুখে যন্ত্রণা। মুখ-চোখ লাল। হাত-চারেক দূরে দু'হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছেন পলাশের বাবা-শম্ভুনাথ। মুখে উত্তেজনা, উদ্বেগ।

মাস-চারেক আগে। শীতের সকালে, পলাশ তার বাবার সঙ্গে বাজার থেকে ফেরার সময় গাড়ি চাপা পড়েছিল। দোষ পলাশের নয়। দোষ গাড়ির। এ-পাড়ার নিখিল বিশ্বাসের বড় ছেলে রোজ সকালে গাড়ি চালানো শেখে। বড় লোকের ছেলে যেমন হয় আর কি! অহঙ্কারী। ভাবে, পয়সার জোরে পৃথিবীতে সবই হয়। যে ভাল করে স্টিয়ারিং ধরতে শেখেনি, সে গাড়ি চালানো শিখছে, বড় রাস্তায়, সাতসকালে। বলার কিছু নেই। বিশ্বাসমশাইয়ের এ-পাড়ায় প্রবল প্রতাপ। তিনি আবার গুণ্ডা পোষেন। কত রকমের কারবার আছে তাঁর।

পলাশের ডান পায়ের ওপর দিয়ে গাড়ি চলে গেল। বারো বছরের ছেলের পায়ের হাড়ের আর কত জোর! ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে গেল। সাত-আটবার অপারেশান করে

কলকাতার সেরা সার্জেনরা একটু-একটু করে তিন মাসের চেষ্টায়, টুকরো-টুকরো হাড় সাজিয়ে প্রায় নতুন একটা পা তৈরি করে ছেড়ে দিয়েছেন। বলেছেন, ছেলেকে বাড়ি নিয়ে যান। যা করার আমরা সাধ্যমতো করে দিয়েছি। ভাগ্য ভাল, কেটে বাদ দিতে হয়নি। এখন সাধনা। হাঁটার সাধনা লাগবে। কষ্ট হবে। তবু ফেলে রাখলে চলবে না। হাঁটতে হবে। হাঁটাতে হবে।

সেই সাধনাই শুরু হয়েছে সাতসকালে। পলাশের মা এতক্ষণ দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। ছেলের কষ্ট আর সহ্য করতে পারলেন না। ছুটে এলেন, "আজ এই পর্যন্তই থাক। দেখছ না, সারা শরীর কাঁপছে। চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠেছে। দরদর করে ঘামছে। আজ ছেড়ে দাও।"

"ঘামুক। ঘামলে কিছু হয় না। ঘামই জীবন। জোর করে না হাঁটলে পা দুটো চিরকালের মতো অকেজো হয়ে যাবে।"

"কী আর করা যাবে, ধরে নাও ভাগ্য।"

"ভাগ্যটাগ্য আমি মানি না। আমি মানি কর্মফল। তোমার কষ্ট হলে, চোখের সামনে থেকে সরে যাও। আমাকে দুর্বল করে দিও না। ডাক্তার আমাকে বলেছেন জোর করে রোজ এক পা, দু'পা করে হাঁটাতে।"

"আমি তো হাঁটাতে বারণ করছি না। আমি বলছি এখন থাক। আবার পরে হবে।"

শাড়ির আঁচল দিয়ে ছেলের কপালের, মুখের, ঘাড়ের ঘাম মুছিয়ে দিলেন। পলাশ দু'হাতে মাকে জড়িয়ে ধরল। সে কেঁদে ফেলেছে। যন্ত্রণা তো আছেই, সেই সঙ্গে দুঃখ। বাবা কেন বুঝছেন না, তার কী ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। তার বাবা কি এতই নিষ্ঠুর!

শম্ভুনাথ লক্ষ করলেন, পলাশের দু'গাল বেয়ে জল নামছে। ধীরে-ধীরে বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে। বুঝলেন, অসম্ভব মনের জোর চাই। দুর্বল হলে চলবে না। ডাক্তারবাবুরা বলেছেন, এ

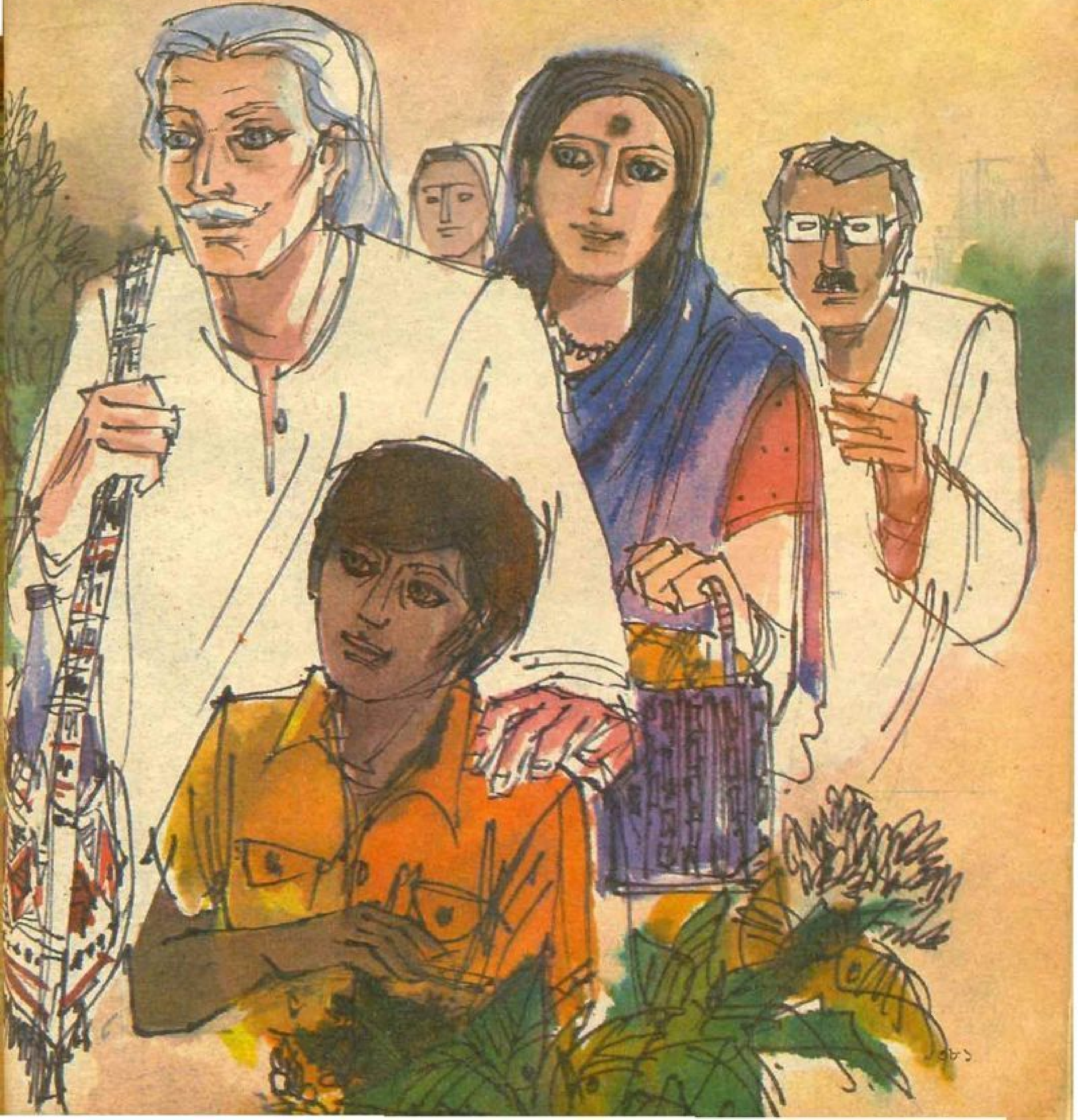

হল চ্যালেঞ্জ। পলাশকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হলে নিষ্ঠুর হতে হবে। ভয়ঙ্কর রকমের নিষ্ঠুর। মায়াদয়া করলে চলবে না। পলাশের পা'টা এমনিই সরু হয়ে গেছে। মন রক্ত-চলাচল হচ্ছে না। ফেলে রাখলে আরও শুকিয়ে যাবে। তখন আর কোনও উপায় থাকবে না। ক্রাচ নিয়ে হাঁটতে হবে।

সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নন শম্ভুনাথ। অনেক লড়াই করেছেন জীবনে। বাকি আছে আরও। ভয় পান না তিনি। হারার আগেই হার স্বীকার করেন না। সকালের রাস্তা। হইহই করে লোক চলেছে। প্যাঁক প্যাঁক করে রিকশা ছুটছে। শম্ভুনাথ স্কুল-শিক্ষক। প্রাইভেটে উঁচু ক্লাসের দু'একজন ছাত্র-ছাত্রীকে পড়ান। কাউকে সপ্তাহে দু'দিন। কাউকে সপ্তাহে একদিন। একজনকেই কেবল সপ্তাহে তিনদিন পড়াতে হয়। ভাল শিক্ষক হিসেবে তাঁর ভীষণ সুনাম। অনেক ধরাধরি করলে তবেই পড়াতে রাজি হন।

পবিত্রর বাড়ির সদরে পৌঁছে ঘড়ি দেখলেন। সাতটা পাঁচ। আজ পাঁচ মিনিট দেরি হয়ে গেল। এমন কখনও হয় না। যেখানে যাকে যা সময় দেওয়া থাকে কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সেই সময়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে যান। তাঁর বাবার কাছ থেকে আরও অনেক শিক্ষার সঙ্গে এই শিক্ষাটি তিনি পেয়েছেন। তাঁর বাবা বলতেন, বিচার করে সব কাজ করবে। কাউকে নয়, নিজেকেই নিজে জিজ্ঞেস করবে, এ কাজ কি আমার করা উচিত? দেখবে, প্রশ্ন করলেই উত্তর পেয়ে যাবে। আর বলতেন, ফেরার রাস্তা ঠিক রেখে তবেই এগোবে। জানবে, মানুষকে আবার শুরুর জায়গাতেই ফিরে আসতে হয়। আর বলতেন, নিজের চেয়ে অন্যের কথাই বেশি ভাববে, তা হলে দেখবে তিনি তোমার কথা বেশি ভাবছেন। আর বলতেন, প্রতিদিন শুরু করবে জীবনের প্রথম দিন ভেবে, আর যখন শুতে যাবে তখন ভাববে এই আমার শেষ দিন। এইভাবে তুমি রোজ সকালে জন্মাবে, আর রোজ রাতে মরে যাবে। দেখবে জীবনটা হয়ে গেছে ফুলের মতো।

পড়ার টেবিলে বসে শম্ভুনাথ কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছলেন। জল এসে গিয়েছিল চোখে। দুঃখে নয়, আনন্দে। এই সুন্দর পৃথিবীতে জন্মাতে পেরেছেন, এই আনন্দ। আরও অনেক আনন্দ। এমন বাবা পেয়েছিলেন, যিনি বলতেন, জীবন হল দীর্ঘ এক সাধনা। এলে আর যেমন-তেমন চলে গেলে তা নয়। শিখে যাও, নিয়ে যাও। শম্ভুনাথের স্ত্রী যখন মাঝেমধ্যে বলেন, 'কবে যে মরব! আর পারি না ভগবান' শুনে হাসেন। শম্ভুনাথ বলেন, 'আমি মরব, আবার জন্মাব বলে। আবার মা'কে মা বলে ডাকব, বাবাকে বাবা। আবার বই বগলে স্কুলে যাব।'

পবিত্র ভাল ছেলে। সব দিকেই ভাল। শম্ভুনাথের প্রিয়। ভদ্র, সভ্য। পবিত্র মুখ ভার করে বসে আছে। সামনে খোলা খাতা। যার মুখের হাসি কোনও দিনই মেলায় না, সে আজ মনমরা কেন?

"শরীর ঠিক আছে তো পবিত্র?"

পবিত্র ঘাড় নেড়ে জানাল, 'আছে।'

"এত মনমরা কেন? কোথায় তোমার সেই আনন্দ?"

পবিত্রর চোখে জল। টলটল করছে।

শম্ভুনাথ বললেন, "আমার কাছে লুকিও না। বলো কী হয়েছে?"

"আমার বাবার…।"

বাকি কথা মুখ দিয়ে বেরোল না।

"কী হয়েছে তোমার বাবার?"

পবিত্র অনেক কষ্টে বললে, "চাকরি চলে গেছে।"

"চাকরি চলে গেছে! কেন? অত ভাল চাকরি!"

"বিদেশী অফিস। এখানকার ব্যবসা উঠিয়ে নিয়ে সিঙ্গাপুরে চলে যাচ্ছে।"

শম্ভুনাথের ভেতর সেই মানুষটা আবার জেগে উঠল, যে-মানুষ কোনও অবস্থাতেই হেরে যায় না, ভয় পায় না। বললেন, "চাকরি গেছে তো কী হয়েছে! নার্ভাস হবার কী আছে! তোমার বাবার চাকরির অভাব হবে না। দিনকয়েক হয়তো বসে থাকতে হবে।"

"বাবা খুব ভেঙে পড়েছেন। বলছেন, দোরে-দোরে ঘুরে-ঘুরে চাকরি জোগাড়ের বয়স আর আমার নেই।"

"বয়েস? বয়েস তো মনের। তার মানে মন ভেঙে পড়েছে।"

"হ্যাঁ, কাল থেকে ভীষণ মনমরা। কারও সঙ্গে কথা বলছেন না। ঘরের দরজা বন্ধ করে শুয়ে আছেন।"

"এখন তিনি কোথায়?"

"শুয়ে আছেন।"

"শুয়ে থাকলে তো চলবে না বাবা। তেড়েফুঁড়ে উঠতে হবে। তোমার বাবার কাছে আমাকে একবার নিয়ে যাবে?"

সারা বাড়ি একেবারে নিস্তব্ধ। পবিত্রর মা'কেও দেখা যাচ্ছে না। বারান্দার একপাশে বিরাট খাঁচায় গোটা-দশেক বদরি পাখির শোরগোল ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

ঘরের দরজায় টোকা মারতে পবিত্র ডাকলে, "বাবা, বাবা।"

উত্তর নেই। শম্ভুনাথ ডাকলেন, "শঙ্করবাবু, শঙ্করবাবু।"

খুট করে দরজার ছিটকিনি খোলার শব্দ হল। সামনে শঙ্করবাবু। একমুখ খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। এলোমেলো চুল। বর্ষার আকাশের মতো মেঘলা মুখ। বিরক্তির গলায় বললেন, "কী হল?" পবিত্রকে বললেন, "চেঁচামেচি করছিস কেন সাতসকালে?"

শম্ভুনাথ বললেন, "চেঁচামেচি ও করেনি, করেছি আমি।"

"আমি এখন একটু ব্যস্ত আছি মাস্টারমশাই," শঙ্কর দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছিলেন। শম্ভুনাথ ঠেলে ঢুকে পড়লেন। সাজানো ঘর অগোছালো হয়ে আছে। টেবিলের ওপর পরপর কয়েকটা চায়ের খালি কাপ। অ্যাশট্রে উপচে পড়ছে সিগারেটের টুকরো, ছাই, দেশলাই-কাঠি। সব জানলা বন্ধ। সিগারেটের ধোঁয়ায় ভেতরটা ঝাপসা।

শম্ভুনাথ পবিত্রকে বললেন, "মা'কে ডাকো। কোথায় তিনি?"

শঙ্কর অন্যমনস্ক খাটের ধারে বসে, বালিশের পাশে পড়ে-থাকা সিগারেটের প্যাকেটের দিকে হাত বাড়ালেন। শম্ভুনাথ তার আগেই প্যাকেটটি টেনে নিলেন। শঙ্কর বিরক্ত হয়ে বললেন, "কী হল?"

"সিগারেট একটু বেশি খাওয়া হয়ে যাচ্ছে। ঘরের অবস্থা দেখেছেন? ধোঁয়ায় ঘর ভরে গেছে। এখন না। ঘণ্টা-দুয়েক পরে আবার ধরাবেন।"

"আমার শরীরের কথা ভাবছেন? এ হল লোহার শরীর, সহজে কিছু হবে না।"

"না হলেই ভাল, তবে বয়েস হচ্ছে তো, সাবধান হতে হবে।"

"দীর্ঘকাল আমি বাঁচতে চাই না।"

"এত সহজে আপনি ভেঙে পড়েছেন কেন?"

"কারণ আছে মাস্টারমশাই। মাসে আটশো টাকা বাড়িভাড়া। ছেলেমেয়ের পড়ার খরচ। সাঙ্ঘাতিক বাজারদর। আপনি হলে আপনিও ভেঙে পড়তেন।"

"আপনি ভগবানে বিশ্বাস রাখেন ?"

"আগে ছিল, আপাতত নেই।"

"কেন নেই ?"

শঙ্কর ভীষণ বিরক্ত হয়ে বললেন, "বিশ্বাস করুন মাস্টারমশাই, এই মুহূর্তে সেই আদ্যিকালের রদ্দি কথা একেবারে অসহ্য লাগছে।"

"এই মুহূর্তে আপনার তা হলে কী ভাল লাগছে ?" বললেন শম্ভুনাথ এতটুকু উত্তেজিত না হয়ে।

শঙ্কর চট করে কোনও উত্তর দিতে পারলেন না। চুপচাপ বসে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন, "একা-একা আপনমনে বসে থাকতে ইচ্ছে করছে দোর বন্ধ করে।"

"এইভাবেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে ?"

শঙ্কর দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে রইলেন উদাস মুখে।

শম্ভুনাথ পবিত্রকে ডেকে বললেন, "আজকের আর গত রবিবারের ইংরেজি কাগজটা নিয়ে এসো।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই কাগজ এসে গেল। শম্ভুনাথ দুটো কাগজেই গোটাকতক কর্মখালির বিজ্ঞাপনে দাগ মেরে দিলেন। তারপর কাগজটা শঙ্করের সামনে ফেলে দিয়ে বললেন, "আমি পবিত্রকে ঘণ্টাখানেক পড়াব, তার মধ্যে আপনি এই তিন জায়গায় দরখাস্ত লিখবেন, কেমন ? আজই ডাকে দিতে হবে।"

"এই বয়েসে কেউ আর আমাকে চাকরি দেবে না। আমার বয়েসটার কথা ভেবেছেন একবার ?"

"ভেবেছি। আপনার লাইনের চাকরিতে অভিজ্ঞতার অনেক দাম। তর্ক না করে যা বলি তাই করুন। আমি এখনও শান্ত আছি, রেগে গেলে কিন্তু রক্ষে থাকবে না। মনে আছে, এই কয়েকদিন আগে আমি আপনাদের টিভির তার ছিঁড়ে দিয়েছিলুম। মানুষের মতো আচরণ করুন। এ কী কথা ! বিছানায় আড় কাত হয়ে একের পর এক সিগারেট খেয়ে গেলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে !" শম্ভুনাথ যথেষ্ট শব্দ করে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর প্রায় ধমকের সুরে বললেন, "উঠে পড়ুন। দশটা ডন, বিশটা বৈঠক মেরে নিন। এই এলানো ভাবটা কেটে যাবে।"

ঠিক দেড়ঘণ্টা বাদে শম্ভুনাথ পবিত্রকে নিয়ে পথে নেমে এলেন। পবিত্রর হাতে ভাঁজ-করা তিনটে দরখাস্ত। পোস্ট অফিস খুলে গেছে। খামে ভরে ডাকটিকিট লাগিয়ে ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে পবিত্র ফিরে আসবে। দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে বাজারের কাছে এসে পড়েছেন। পথের ধারে ছোলা-শাক বিক্রি হচ্ছে। সবুজ-সবুজ, কচি-কচি ছোলা ধরে আছে। শম্ভুনাথ দাঁড়িয়ে পড়লেন। ছোলা-শাক দেখলেই তাঁর ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যায়। সেই মুঙ্গের জেলা। বিহারি গ্রাম। শীতের সকাল। বাবা ছিলেন রেলের স্কুলের প্রধানশিক্ষক। আবার ডাকসাইটে খেলোয়াড়। যেমন ফুটবলে, তেমনি ক্রিকেটে। সায়েবদের সঙ্গে টেনিস খেলতেন সিংহবিক্রমে। বাবার সঙ্গে রোজ সকালে মাইলের পর মাইল হাঁটা। দু'জনের হাতে দু'তাড়া ছোলা-শাক। ছোলা খেতে খেতে, গল্প করতে করতে চলা। মাঠ পেরিয়ে বন, বন পেরিয়ে পাহাড়। এই হাঁটতে হাঁটতেই গ্রামার পড়ান। পুরো নেসফিল্ড এই ভাবেই শেখা।

শম্ভুনাথ পবিত্রকে জিজ্ঞেস করলেন, "সকালে কী খেয়েছ ?"

পবিত্র চুপ করে রইল।

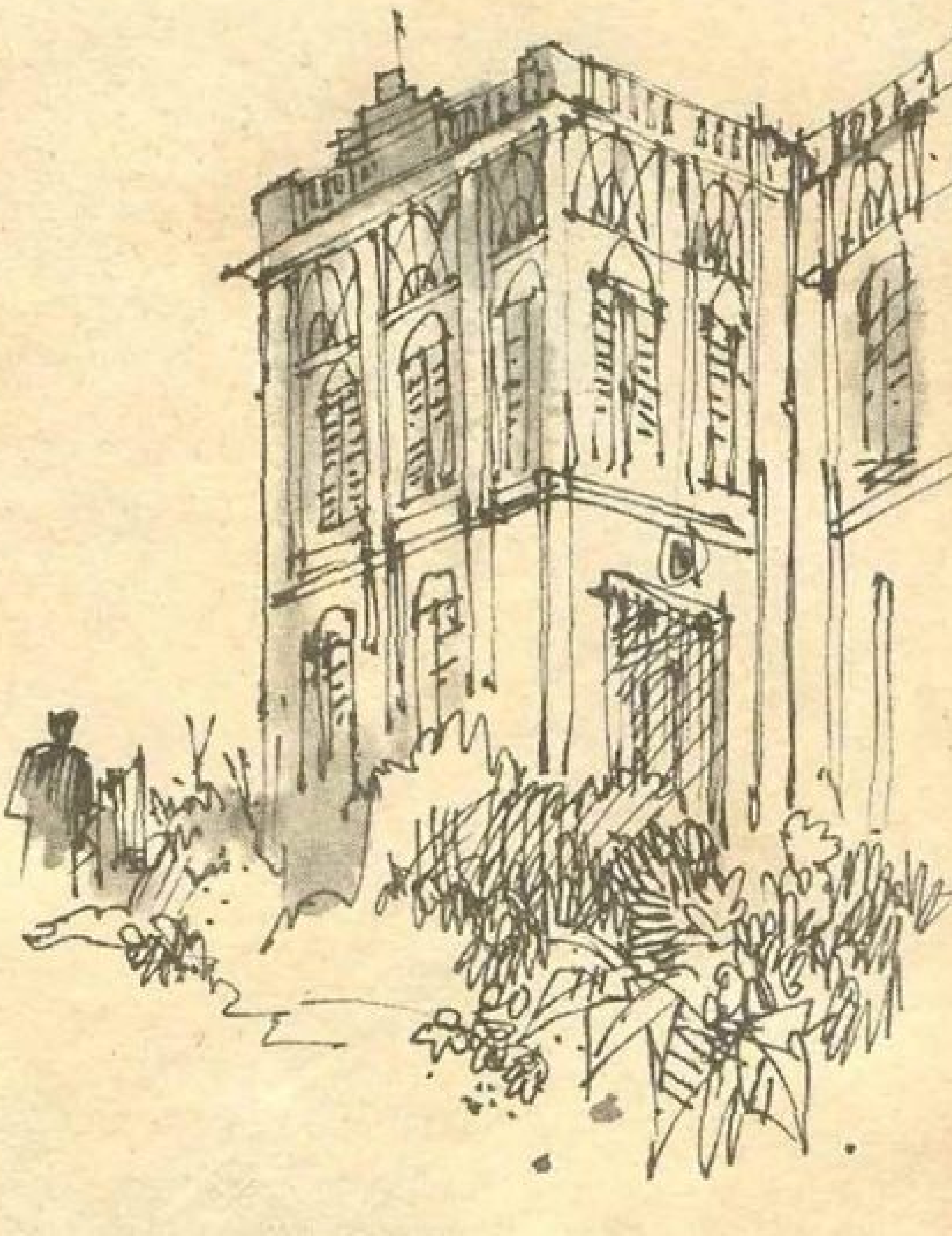

"তার মানে কিছুই খাওনি ?"

পবিত্র কোনও উত্তর দিল না।

"সকালের জলখাবার বন্ধ, তাই তো ! খরচ বাঁচাচ্ছেন তোমার বাবা !"

শম্ভুনাথ দু'আঁটি ছোলা-শাক কিনলেন, "নাও ধরো। ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে খাও। বড় সুন্দর জিনিস। সকালে তোমাদের কী জলখাবার হয় ?"

"টোস্ট। ডিমসেদ্ধ। কলা।"

"সায়েবি-খানা। কোনওদিন ছাতু খেয়েছ ?"

"না স্যার।"

"খেয়ে দেখতে পারো। ছোলার ছাতু আর আখের গুড়। উপাদেয় জিনিস। খরচ খুবই কম, অথচ গায়ে গত্তি লাগবে।"

পোস্টাপিসের কাছে এসে শম্ভুনাথ বাঁ দিকে ঘুরে গেলেন। পবিত্র ঢুকে গেল পোস্টাপিসে। তেমন ভিড় নেই। মনমেজাজ খুব খারাপ। এতক্ষণ মাস্টারমশাই ছিলেন, মনটা বেশ চাঙ্গা ছিল। তিনি চলে গেলেন, মনে হচ্ছে সব ফাঁকা। মাস্টারমশাইকে সব সময় যদি কাছে পাওয়া যেত, বেশ হত।

শম্ভুনাথ আবার বাঁ দিকে ঘুরলেন। রাস্তা ক্রমশই সরু হয়ে আসছে। এটা একটা কানাগলি। গলির শেষে সাবেক আমলের একটা ভাঙা বাড়ি। বাড়িটার চারপাশে বেশ খানিকটা খোলা জায়গা। এক সময় বাগান ছিল। পাথরের মূর্তি ছিল। ফোয়ারাও ছিল। টিনের গেটটা ঠেলতেই খুলে গেল। ভেতরটা বড় নির্জন। বুনোগাছে হলদে হলদে ফুল ফুটেছে। গোটাচারেক প্রজাপতি লাল, সাদা কাগজের টুকরোর মতো বাতাসে উড়ছে। দোতলার বারান্দা নানা রঙের কাঁচ দিয়ে ঘেরা। এসব কাঁচ আগে বিদেশ থেকে আসত।

নীচের বিশাল হলঘরে একগাদা লাউ আর সেতার। তার মাঝে বসে আছেন এক বৃদ্ধ। ফরসা টুকটুকে রঙ। ঘাড় অবধি বড় বড় চুল। অবিকল ঋষির মতো দেখতে, যেন মহাভারতের পাতা থেকে উঠে এসেছেন। নতুন সেতারে তার চাপাচ্ছেন বৃদ্ধ। পুবের জানালা দিয়ে রোদ এসে মেঝেতে লুটিয়ে পড়েছে। শম্ভুনাথকে দেখে চোখ তুলে তাকালেন। মৃদু হেসে বললেন, "এসো শম্ভুনাথ। বসে পড়ো। তোমার জিনিসই তৈরি হচ্ছে।"

সেতারে টুংটাং শব্দ হচ্ছে। বড় মিঠে আওয়াজ। শম্ভুনাথ একপাশে বসে পড়লেন। বৃদ্ধের নাম বিমান ঘোষ। একা এই বিশাল বাড়িতে থাকেন। এক সময় বিরাট অবস্থা ছিল। অনেক লোকজন ছিল বাড়িতে। সব সময় গমগম করত। পায়রা উড়ত ছাদের আকাশে। গাড়ি ছিল তিন-চারখানা। সব গেছে। গেলেও কোনও দুঃখ নেই মানুষটির। ভীষণ ভাল সেতার বাজান। শিখেছিলেন বড় গুরু ধরে। সেই সেতারই এখন তৈরি করেন। সারা ভারতের বড় বড় ওস্তাদদের বিমানবাবুর সেতার ছাড়া চলে না। মানুষ যেন ঠেলাগাড়ি। ভগবান ঠেলতে ঠেলতে যেখানে, যেদিকে নিয়ে যাবেন সেই দিকে, সেইখানেই যেতে হবে। এই পলাশের অবস্থাটাই দ্যাখো না। সুস্থ, সবল, সুন্দর ছেলে, সকালে বাজার করতে বেরোল। বাস্, ফেরার পথে মেরে দিয়ে চলে গেল। তাও মারলে কী ভাবে, একেবারে রাস্তার ধারে এসে।

সেতারে সুর ধরে গেছে। বিমান ঘোষ চোখ বুজিয়ে, ঘাড় হেলিয়ে আলাপ করছেন। বৃদ্ধের মেজাজ এসে গেলে সময়ের হিসেব থাকে না। শম্ভুনাথ অবাক হয়ে দেখছেন, তারের ওপর হাত চলেছে কী সহজে!

হঠাৎ বাজনা থামিয়ে বিমান বললেন, "মনে হচ্ছে যন্ত্রটা ভালই বাজবে। তোমার ছেলের এখন পছন্দ হলে হয়।"

"যন্ত্রের সে কী বোঝে? সবে তো এ· বি· সি· হচ্ছে।"

"না হে, যে সুরের কান নিয়ে এসেছে, সে এক টুসকিতে ধরে ফেলবে। আওয়াজটা বেশ মিঠে হয়েছে, তাই না?"

"আপনি কি তা হলে সপ্তাহে একদিন করে আসবেন?"

"অবশ্যই আসব। আজকে হাঁটাবার চেষ্টা করেছিলে?"

"করেছিলুম। তবে সম্ভব হল না। এক পা'ও হাঁটতে পারল না।"

"হাল ছেড়ো না। ধৈর্য ধরে চেষ্টা চালিয়ে যাও। তুমি তো জানো শম্ভুনাথ, শরীর কিছু না। মনটাই সব। আমার সেই রয়াল এনফিল্ড মোটরবাইক দুর্ঘটনার কথা তোমার মনে আছে। মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ে রইলুম ছ'মাস। সার্জেনরা বললেন, বাকি জীবনটা বিছানায় কাটাতে হবে। আমার রোখ চেপে গেল, কী, বিছানায় কাটাতে হবে? চালাকি! শুরু করে দিলুম ব্যায়াম। ফল? তোমার চোখের সামনে। বসে আছি খাড়া। এই বয়েসে এখনও আমি রোজ ভোরবেলা ব্যায়াম করি। মনের জোর কী করে বাড়ে জানো?"

"কী করে বিমানদা?"

"সামনে উদাহরণ খাড়া করো। ইংরেজিতে কী বলে জানো? এগজাম্পল ইজ বেটার দ্যান প্রিসেপ্ট। উপদেশের চেয়ে উদাহরণ অনেক ভাল।"

"জোরালো মনের মানুষ পাব কোথায় বিমানদা?"

"কেন, তুমি! তোমার তো সাঙ্ঘাতিক মনের জোর। তা ছাড়া বই। ভাল-ভাল জীবনী পড়তে দাও। প্রার্থনা করতে শেখাও। স্তোত্রপাঠ, বন্দনাগান। তারপর এই সেতার। সুরের কত শক্তি জানো, অসুরের মতো।"

বিমান উঠে পড়লেন।

"কোথায় চললেন আপনি?"

"একটু বোসো, আমি উনুনটা ধরিয়ে আসি। এখনও সকালের চা'টাই খাওয়া হয়নি।"

"সে কী?"

"ওই যে তোমাকে কথা দিয়েছিলুম, আজই যন্ত্রটা দোব।"

"ছি ছি, একদিন দেরি হলে, কী এমন ক্ষতি হত!"

"না, শম্ভুনাথ, মরে না গেলে কথা রাখার চেষ্টা করবে। মনের জোর বাড়াবার এও একটা পথ।"

"বিমানদা কত পড়ল?"

"কী কত পড়ল?"

"যন্ত্রটা।"

"এক পয়সাও না। পারো তো ভালবাসা দিয়ে শোধ কোরো। আমাকে না, সুরের দেবীকে। যন্ত্রটা ফেলে রেখো না, রোজ বাজিও। হুজুগে যন্ত্র করায়। দু'দিন পিড়িং পিড়িং করে তারপর পড়েই থাকে। পড়ে পড়ে ধুলো খায়।"

"আমি তা হলে সেতারটা নিয়ে যাই।"

"না, আমি নিজে নিয়ে যাব বিকেলে। আর-একবার পালিশ করব। তুমি এখন যাও। ও হ্যাঁ, যাবার সময় তুমি আমার এই ডায়েরিটা নিয়ে যাও। তোমার ছেলেকে পড়তে দিও। এতে আমার জীবনের অনেক অভিজ্ঞতার কথা লেখা আছে। জানো, আমি একবার গভীর এক খাদে পড়ে গিয়েছিলুম। তোমাকে কোনওদিন সে-ঘটনার কথা বলেছি?"

"না।"

"এই ডায়েরিতে লেখা আছে। পড়ে দেখো। মরেই যেতুম। বেঁচে গেলুম স্রেফ মনের জোরে।"

শম্ভুনাথ ডায়েরি হাতে বেরিয়ে এলেন রাস্তায়। রোদ বেশ চড়ে গেছে। বিশ্ববন্ধুর সঙ্গে একবার দেখা করার ইচ্ছে ছিল, তা আর হল না এবেলা। ওবেলা দেখা যাবে। শম্ভুনাথ হনহন করে হাঁটতে লাগলেন।

২

খাঁ খাঁ করছে দুপুর। মা বুনতে-বুনতে ঘুমিয়ে পড়েছেন। পাড়া একেবারে নিস্তব্ধ। জানলার ধারে খাট। সেই খাটে পিঠে গোটাকতক বালিশ দিয়ে পলাশ বসে আছে। বসে-বসে রাস্তা দেখছে। রাস্তা একেবারে ফাঁকা। কিছু আগেও দু-একজন লোক চলছিল। এখন আর কেউ নেই। এই সময়টায় পলাশের ভীষণ খারাপ লাগে। বন্ধুরা সব স্কুলে। একটু পরেই তারা খেলার মাঠে জড়ো হবে। ভাবতে ভাবতে পলাশের চোখে জল এসে গেছে। সামনে ছড়ানো দুটো পা। ডান পা'টা বাঁ পায়ের চেয়ে কত সরু হয়ে যাচ্ছে। আর কি সে হাঁটতে পারবে! আর কি দৌড়তে পারবে আগের মতো! সেই গাড়ির ড্রাইভারটার ওপর তার ভীষণ রাগ হয়। কেন সে সাবধানে গাড়ি চালায় না। কেন সে হুড়মুড় করে চলে এল রাস্তার একেবারে ধারে। তাকে চাপা দিয়ে কেমন তীরবেগে পালিয়ে গেল! কেউ ধরতেই পারল না। পালাবার সময় একটা রিকশাকেও ধাক্কা মেরেছিল।

পলাশ আকাশের দিকে তাকাল। নীল আকাশ একেবারে ফাঁকা। অনেক উঁচুতে একটা চিল উড়ছে। পাশের ঘরে মা ঘুমোচ্ছেন। মায়ের অল্প-অল্প নাক ডাকছে। পলাশ শুনতে

পাচ্ছে। মায়ের যেন কোনও চিন্তাই নেই। কেমন সহজে ঘুমিয়ে পড়েন যখন-তখন। পলাশ ভাঙা ডান পা'টাকে মাঝে-মাঝে নাড়াচ্ছে। নড়ছে, কিন্তু তেমন জোর নেই। লগবগ করছে। একটু আগেই পলাশ বিমানবাবুর ডায়েরিটা পড়ছিল। বাবা পড়তে দিয়ে গেছেন।

"ছেলেবেলায় আমার রিকেট ছিল।" লিখছেন বিমানজেঠু।

"হাত-পা লিকলিকে। মাথাটা বিশাল। ভাল করে হাঁটতে পারতুম না। উঠে দাঁড়াতে গেলে মাথা উলটে পড়ে যেতুম। সবাই কাতলা মাছ বলে হাসিঠাট্টা করত। বড়-বড় ছেলেরা সুযোগ পেলেই ধরে-ধরে মারত, আর আমি পড়ে-পড়ে কাঁদতুম। এই ভাবেই আমি বড় হতে লাগলুম। খ্যাংরাকাঠির মাথায় আলুর দম। এই চেহারা নিয়েই আমি স্কুলে ভর্তি হলুম। লেখাপড়ায় খারাপ ছিলুম না। তবু আমাকে ঠেলে-ঠেলে লাস্ট বেনচে বসানো হত। লাস্ট বেনচ মানেই যত অসভ্য, শয়তান ছেলের ভিড়। তাদের অত্যাচারে মাঝে-মাঝে মনে হত স্কুল ছেড়ে দেব। মাস্টারমশাইরাও মাঝে-মাঝে ধরে খুব চড়চাপড় মারতেন। এই যখন অবস্থা, তখন একদিন আমাদের পাড়ায় সনাতনকাকুর বাড়িতে হিমালয় থেকে এক সন্ন্যাসী এলেন। কী সুন্দর তাঁর চেহারা। পাক্কা ছ'ফুট লম্বা। টকটক করছে গায়ের রঙ। মুখে সবসময় লেগে আছে মিষ্টি হাসি। মায়ের সঙ্গে সন্ন্যাসীকে দেখতে গেলুম। মা বললেন, 'প্রণাম করো।'

"প্রণাম করতেই সাধুবাবা আমার দু'কাঁধ ধরে খুব জোরে এক ঝাঁকুনি দিলেন। প্রথমে মনে হল, আমার হাড়গোড় খুলে পড়ে যাবে। মাথাটা ছিটকে বেরিয়ে যাবে দেহ ছেড়ে। ঝাঁকুনি দিয়ে ছেড়ে দিতেই আমি দুম করে পড়ে গেলুম। সাধুবাবা হোহো করে হাসতে লাগলেন। লজ্জায়, অপমানে আমার চোখে জল এসে গেছে। সাধুবাবার ওপর রাগে আমার শরীর কাঁপছে। এ কীরকম সাধু! স্কুলের লাস্ট বেনচের ভুতো আর ন্যাড়ার সঙ্গে কোনও তফাতই নেই।

"সাধুবাবা হঠাৎ এগিয়ে এসে আমাকে বুকে তুলে নিলেন। একেবারে জড়িয়ে ধরলেন। কত বড় বুক! যেন কাঠের পাটাতন! গা দিয়ে মিষ্টি চাঁপাফুলের গন্ধ বেরোচ্ছে।

"সাধুবাবা বললেন, 'বোকা ছেলে, কাঁদছিস তুই! কাল থেকে দেখবি, তোর শরীর ভাল হতে শুরু করেছে। আমি তোকে ঝেড়ে দিলুম। কাল বিকেলে আসিস। আমি তোকে এইটার চেয়েও বলবান করে দোব।' সাধুবাবা আঙুল দিয়ে নিজের শরীর দেখালেন।

"খুশি মনে বাড়ি ফিরে এলুম। রাতের দিকে কেঁপে জ্বর এসে গেল। ভীষণ জ্বর। জ্বরের ঘোরে শুনলুম, বাবা মা'কে বকছেন। 'কে বলেছিল তোমাকে ওই ডিঙডিঙে ছেলেটাকে সাধুবাবার কাছে নিয়ে যেতে। দ্যাখো, কী হয় এখন? বাঁচে না মরে।' জ্বরের ঘোরে স্বপ্ন দেখলুম, অনেক উঁচু একটা পাহাড়ের মাথায় একটা সরোবর। চারপাশে বরফ অথচ সরোবরের জল নীল টলটলে। একটা-দুটো বিশাল আকারের পদ্মফুল ভাসছে। অত বড় পদ্ম আমি জীবনে দেখিনি। পাহাড়ের মাথায় ওঠার সময় আমি কেবলই ভাবছিলুম, আমার এত শক্তি এল কোথা থেকে। ভীষণ শীত করছে। নীল জলে ছড়িয়ে আছে ছোট-ছোট তরঙ্গ। জলের অত সুন্দর রঙ আর অত বড়-বড় পদ্ম দেখে স্থির থাকতে পারলুম না। চান করব। করুক শীত। ঝাঁপিয়ে পড়লুম জলে। প্রথমে সারা শরীর যেন জমে গেল। তারপর কী আরাম! সমস্ত শরীর যেন জুড়িয়ে গেল।

"ভোরবেলা ঘুম ভেঙে গেল। দেখি আমার গলার কাছে হাত রেখে মা গা দেখছেন। আমাকে চোখ মেলতে দেখে বললেন, 'খোকা, কী আশ্চর্য, তোর জ্বর ছেড়ে গেছে। গা একেবারে বরফের মতো ঠাণ্ডা।'

"সেইদিনই সাধুবাবার কাছে আমাকে নিয়ে গেলেন আবার। তিনি আমাকে দেখে হাসতে লাগলেন মুচকি-মুচকি। বললেন, 'কী, কাল কেমন চান করলি বরফ-ঠাণ্ডা জলে?'

"আমি তো অবাক! 'কেমন করে জানলেন আমার স্বপ্ন?'

"তিনি বললেন, 'স্বপ্ন কেন হবে, সত্যিই তো!'

"'সত্যি! সত্যিই আমি মানসে চলে গিয়েছিলাম কাল রাতে?'

"'বিশ্বাস হচ্ছে না তোর! বাড়ি গিয়ে দ্যাখ। তোর বিছানায় ব্রহ্ম-কমলের একটা পাপড়ি পড়ে আছে তোর মাথার বালিশের পাশে।'

"সত্যিই অবাক কাণ্ড। এমনও হয়! আমাদের শোবার ঘরে থমথম করছে সুন্দর গন্ধ। সে গন্ধ ধূপের নয়। ধুনোর নয়। অমন গন্ধ আগে আর কখনও পাইনি। আর বালিশের পাশে পড়ে আছে স্বপ্নে-দেখা সেই ফুলের একটি পাপড়ি।

"সন্ন্যাসী যথাসময়ে চলে গেলেন। যাবার আগে দিয়ে গেলেন, আমার কানে এক অক্ষরের একটি মন্ত্র। আর দিয়ে গেলেন গুলির আকারের ছোট্ট একটা নীলচে পাথর। বলে গেলেন, 'রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে চোখ বুজিয়ে এই পাথরটা ডান হাতের আঙুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করবি; আর করবি রাতে বিছানায় বসে শুতে যাবার আগে।'

"'কী হবে?'

"সন্ন্যাসী হাসলেন, 'কিছু-একটা হবে। তবে পাথরটা যত্ন করে রাখবে। হারায় না যেন! তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা নাও হতে পারে। দেখবে, তোমার যখন যাবার দিন আসবে, তার আগে থেকেই পাথরটা সাদা হতে থাকবে। একদিন সকালে উঠে দেখবে একেবারে সাদা হয়ে গেছে, কোথাও আর নীলের ছিটেফোঁটাও নেই। সেইদিন সন্ধেবেলা পাথরের গুলিটা একেবারে গুঁড়ো ছাইয়ের মতো হয়ে যাবে। সেই গুঁড়োটা তুমি সঙ্গে-সঙ্গে জিভে ফেলে দেবে। তার আগে স্নান করবে, পুজোর কাপড় পরবে, ধূপ জ্বেলে দেবে ঘরে। দরজা, জানলা সব বন্ধ করে দেবে। পুজোর আসনে বসে ওই একাক্ষর মন্ত্র জপ করতে থাকবে। এক মনে। মন্ত্রের অক্ষর চোখের সামনে জ্বলে উঠবে আগুনের মতো।'

"'সেই কি আমার মৃত্যু?'

"সন্ন্যাসী বলেছিলেন, 'এখন বুঝবি না, পরে বুঝবি, জন্ম আর মৃত্যু বলে কিছু নেই। আছে গভীর থেকে অগভীরে ভেসে ওঠা। মনে রাখ্ কথাটা, পরে মিলিয়ে নিস্, গভীর থেকে অগভীরে ভেসে ওঠা, আবার গভীরে তলিয়ে যাওয়া।'

"'এই পাথরের গুলি অনেক-অনেক দিন নীল রাখার উপায়? কোনও দিনও যেন সাদা না হয়, এর কোনও উপায় আছে?'

"'আছে। ইচ্ছাশক্তি। পৃথিবীতে থাকার ইচ্ছে, কাজ করার ইচ্ছে, মানুষের ভাল করার ইচ্ছে, ভগবানকে ডাকার ইচ্ছে। ভাল, ভাল ইচ্ছের রঙই হল নীল। দেখিস না, আকাশ যখন পরিষ্কার তখন কেমন নীল! এই পাথরের গুলিটা হল তোর মন। মন যতদিন নির্মল থাকবে সৎ ইচ্ছায় ভরপুর থাকবে, ততদিন পাথর থাকবে নীল। যেই মন বলতে থাকবে, না এবার যাই, এবার আমাকে যেতে হবে, অমনি পাথর সাদা হতে শুরু করবে।'

"সাধু একদিন, 'জয় রামচন্দ্রজি কি জয়' বলে ডেরা উঠিয়ে ফেললেন। আমরা সবাই একে-একে প্রণাম করলুম। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সাদা হতে শুরু করেছে।' কেউই বুঝল না সে-কথা। আমি কিন্তু কেঁদে ফেললুম। বললেন, 'কাঁদছিস কেন পাগল। আমি দেখা করে যাব তোর সঙ্গে।'

"'কী ভাবে?'

"'সে তো আমার ভাবনা। তুই সবসময় ঘরে আমার জন্যে গঙ্গাজল আর সাদা বাতাসা রাখবি। সারা জীবন রাখবি। কখন এসে পড়ব, কেউ কি বলতে পারে!'

"সাধু চলে গেলেন, হাঁটতে-হাঁটতে, দূর থেকে দূরে। তাঁর চলার ভঙ্গি, গেরুয়া বসন, হাতের দীর্ঘ লাঠি, আজও আমার চোখে ভাসে। আজও আমি গভীর রাতে তাঁর জন্যে নীরবে কাঁদি। সত্যি কথা বলতে কী, আমি তাঁকে ধরেই আজও বেঁচে আছি।"

পলাশ ডায়েরিটা বন্ধ করে রাখল। ডায়েরি মানে রেক্সিন-বাঁধানো একটা মোটা খাতা। মলাটে সোনার জলের নকশা করা। নকশাটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে-থাকতে তার চোখে ঘোর লেগে গেল। কেবলই মনে হতে লাগল, জীবন হল ইচ্ছাশক্তি। বাঁচার ইচ্ছে, কাজ করার ইচ্ছে, ওঠার ইচ্ছে, বসার ইচ্ছে, শোয়ার ইচ্ছে, চলার ইচ্ছে, পড়ার ইচ্ছে। বিমানদাদুকে একদিন দেখা হলে বলবে পলাশ, 'আপনার নীল পাথরের গুলিটা আমাকে দেখাবেন!'

পলাশের মনে হল, ইচ্ছেটাই যদি সব হয়, তা হলে তার এখন খাট থেকে নেমে ভীষণ চলতে ইচ্ছে করছে। হাঁটতে হাঁটতে সোজা চলে যাবে শ্যামলীদের বাড়িতে। ওদের ছাদটা ভারী সুন্দর। টবে-টবে অনেক গাছ। দুপুরে অনেকটা জায়গা জুড়ে ছায়া পড়ে। শ্যামলীদের বাড়িতে অনেক অনেক বই আছে। প্রায় একটা লাইব্রেরি। প্রতি মাসে শ্যামলীর বাবা কিছু-না-কিছু বই কেনেন। অনেক পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন আসে। শ্যামলীর মা যেমন ভাল, বাবাও তেমনি ভাল। শ্যামলীর তো কোনও তুলনা হয় না। পলাশ পরি কোনওদিন দ্যাখেনি। গল্পেই পড়েছে। শ্যামলীর দু'পাশে দুটো ডানা লাগিয়ে দিলে পরি হয়ে যাবে। শ্যামলীর বাবা আবার পাইলট। দেখা হলেই আকাশে ওড়ার কত গল্প বলেন। অফুরন্ত গল্প।

পলাশ খাটের পাশে মেঝেতে পা রেখে, খাটের মাথার দিকটা ধরে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। পারল না। ডান পায়ে একেবারে জোর নেই। পাটকাঠির মতো মট করে ভেঙে না যায়! যেখানে যেখানে কুচো হাড়, টুকরো হাড় জোড়া লাগানো হয়েছে, সেইসব জায়গা যেন ভেতর থেকে খচখচ করছে। সামান্য চেষ্টাতেই পলাশ ঘেমে গেল। আবার ধীরে-ধীরে বসে পড়ল বিছানায়। ভাঙা পা'টাকে সামনে ছড়িয়ে দিয়ে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। কিছুদিন আগেও এই পা কত ঘুরেছে, ফুটবল খেলেছে, ছুটেছে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে জল এসে গেল পলাশের চোখে। বিমানদাদু ইচ্ছাশক্তির কথা লিখেছেন। তার তো ভীষণ ইচ্ছে করছে হাঁটতে। কই পারছে না তো।

দরজার কাছে পায়ের শব্দে পলাশ চোখ তুলে তাকাল। ভেবেছিল, মা এসেছেন। অবাক হয়ে গেল। শ্যামলী এসেছে। হাতে তিন-চারখানা নতুন বই। পলাশ চট করে চোখ দুটো মুছে নিল। তবু শ্যামলীর চোখকে ফাঁকি দেওয়া গেল না। সে এগিয়ে আসতে আসতে বললে, "তুই একা-একা ঘরে বসে-বসে কাঁদছিস!"

"কই না তো? কাঁদব কেন? ব্যাটাছেলেদের কাঁদতে আছে?"

"তা হলে তোর চোখে জল কেন?"

"ও এমনি। মাঝে-মাঝে জল দিয়ে আমি চোখ ওয়াশ করি, তাতে চোখের লেনস ভাল থাকে।"

"এই দ্যাখ, তোর জন্যে আমি ভাল-ভাল চারখানা নতুন বই এনেছি। ভেতরের গন্ধ শুঁকে দ্যাখ। কী সুন্দর গন্ধ," শ্যামলী বই চারখানা বিছানায় রেখে বললে, "আর কী এনেছি বল্ তো?"

"কী রে?"

"বল্ না, দেখি কেমন বলতে পারিস?"

"লজেন্স।"

"হল না। খাবার জিনিস নয়।"

"তা হলে?"

"চোখ বুজিয়ে ভাব। ভেবে বল্।"

পলাশ কিছুক্ষণ ভেবে বললে, "আমার মাথায় আসছে না। তুই বলে দে শ্যামলী।"

"তোর মাথায় কী আছে রে?"

"পা। আমার ডান পা'টা পা ছেড়ে মাথায় ঢুকে পড়েছে। শ্যামলী আমি আর কোনও দিনও হাঁটতে পারব না রে! এই বিছানায় বসে-বসে আমি বড় হব, বুড়ো হব, মরে যাব একদিন।"

পলাশ কেঁদে ফেলল আবার। শ্যামলীর মুখটাও কাঁদো-কাঁদো। গত বছর গ্রীষ্মের ছুটিতে তারা সবাই মিলে কালিম্পং গিয়েছিল। দু'জনেরই মনে পড়তে লাগল সেই সব কথা। শ্যামলীরা এ-বছর যাবে আরও দূরে, কুলু ও কাঙড়া

উপত্যকায়। পলাশ সুস্থ থাকলে যেতে পারত ওদের সঙ্গে। কী মজাই না হত তা হলে।

নরম নরম আঙুল দিয়ে পলাশের চোখের জল মুছিয়ে দিতে-দিতে শ্যামলী বললে, "তুই অত ভেঙে পড়িস না তো! তোর পা আর-এক মাস পরে ঠিক হয়ে যাবে।"

"কী করে বুঝলি?"

"আমার মন বলছে।"

"তোর মন যা বলে তাই হয়!"

"তাই হয়। সেইজন্যে খারাপ কিছু হবার হলে কেউ আর আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করে না।"

"তার মানে, তুই খারাপটাই দেখতে পাস। তোর ক্ষমতা ওই দিকেই।"

"আজ্ঞে না। আমি ভালটাও দেখতে পাই আগেভাগে। ওসব মেয়েলি কথা ছাড় তো। আয়, অন্য কথা বলি।"

"ধুর্, অন্য কথা আমার ভালই লাগছে না। বিছানায় পড়ে আছি তিন মাস। কিছুতেই হাঁটতে পারছি না আমি।"

"তুই পরীক্ষা দিবি না?"

"পরীক্ষা তো দিতেই হবে। লেখাপড়াটাই তো এখন আমার রাস্তা।"

"তা, সে রাস্তায় হাঁটছিস কই! ও-রাস্তায় হাঁটতে হলে পায়ের তো প্রয়োজন হয় না। মন দিয়েই হাঁটা যায়। সারাদিন বিছানায় জানালার ধারে বসে আছিস আর পা-পা করছিস। পা দিয়ে কী হয় রে এই গাড়ির যুগে। চল্, ওঠ। আমার সঙ্গে ছাতে চল্। জলের ট্যাঙ্কের ছায়ায় বসে-বসে দু'জনে আমের আচার খাই জমিয়ে।"

পলাশ শ্যামলীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ। মা দুর্গার মতো মুখটা। বড়-বড় টানা-টানা নীল দুটো চোখ। একমাথা কালো রেশমের মতো চকচকে চুল। তাকিয়ে থাকতে-থাকতে পলাশ কেঁদে ফেলল।

শ্যামলী বললে, "কী হল রে! আবার জল!"

পলাশ ধরা-ধরা গলায় বললে, "আমার ভীষণ ইচ্ছে করছে, ছাতে যাই। জলের ট্যাঙ্কের পাশে বসি। অপরাজিতা গাছে সাদা, নীল ফুল এসেছে আমি জানি, আমি জানি ফুলগাছের টবের শুকনো মাটিতে গর্ত খুঁড়ে চড়াই ধুলোয় চান করছে। আমি সব দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু যেতে পারছি না, পারবও না কোনওদিন। তবু তুই আমায় লোভ দেখাচ্ছিস!"

শ্যামলী পলাশের পাশে সরে এল। তার চোখও ছলছল করছে। সেও আর একটু হলে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলত। হঠাৎ কোথা থেকে ভীষণ জোর এসে গেল মনে। হেরে যাবার আগে তার এইরকম হয়। ভেতরে ভূমিকম্পের মতো কী যেন একটা ঘটে। কান দিয়ে আগুন বেরোতে থাকে। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে ওঠে। মেঘ ডেকে ওঠে মনে, 'হেরে যাবি? তুই হেরে যাবি?' স্পষ্ট শুনতে পায়। কে যেন কানের কাছে বলতে থাকে, 'হেরে যাবি তুই!'

বুকের ভেতর থেকে ফুল-আঁকা ছোট্ট একটা মেয়েলি রুমাল বের করে শ্যামলী পলাশের চোখের জল মোছাতে-মোছাতে বললে, "শঙ্করদাকে চিনিস?"

পলাশ ঘাড় নেড়ে জানাল, হ্যাঁ চেনে।

"পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের সময় শঙ্করদার ডান পা'টা হাঁটুর ওপর থেকে কেটে দিতে হয়েছিল, মনে আছে?"

"আছে।"

"সেই শঙ্করদা কি দমে গেছেন! শঙ্করদাকে কেউ হারাতে পেরেছে! কাঠের পা নিয়ে হিল্লিদিল্লি করছেন। নিজের গাড়ি নিজেই চালান। কী বিরাট ব্যবসা করেছেন! বিশাল কারখানা। পঞ্চাশ-ষাট জন লোক চাকরি করে। তোর চোখের সামনে এইরকম একজন মানুষ রয়েছেন আর তুই কিনা ভেঙে পড়ছিস!"

"শঙ্করদা বড়লোকের ছেলে।"

"বড়লোকের ছেলে তো কী হয়েছে। পয়সায় মনের জোর বাড়ে! মনের জোর মন দিয়ে বাড়াতে হয়। নে, পা ঝোলা। মাটিতে দু'পা ভাল করে রাখ।"

পলাশ দু'পা মাটিতে রাখল। শ্যামলী পলাশের গা ঘেঁষে বসে আছে। পলাশের ডান হাতটা ঘুরিয়ে নিজের ডান কাঁধের ওপর দিয়ে সামনে নিয়ে এল। বাঁ হাত দিয়ে পলাশের কোমর জড়িয়ে ধরল।

"নে ওঠ। ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়া।"

"আমি পারব না। এই দ্যাখ, আমার পা কাঁপছে।"

"পা কাঁপছে না, তোর মন কাঁপছে। তুই পায়ের কথা ভুলে যা। তুই আমার কথা ভাব। ভাব আমি তোর পাশে আছি।"

পলাশের ভেতরটা হঠাৎ আনন্দে দুলে উঠল। শ্যামলী তার বন্ধু। এত বন্ধু, তা তো কোনও দিন বুঝতে পারেনি। শ্যামলীর ফর্সা টুকটুকে গোল-গোল হাতে, নীল-নীল কাঁচের চুড়ি। সরু-সরু আঙুল। পলাশ মনের জোরে উঠে দাঁড়াল। ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। পা কাঁপছে। শরীর কাঁপছে। তবু সে দাঁড়িয়ে রইল শ্যামলীর কাঁধে হাত রেখে।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে শ্যামলী বললে, "নে, এবার প্রথমে ডান পা'টা সামনে বাড়া। ভয় নেই, আমি তোর শরীরের ভার রেখেছি। আর যাই হোক, তুই পড়ে যাবি না।"

পলাশ ডান পা বাড়াল, তারপর বাঁ পা। আবার ডান পা, তারপর বাঁ পা। এইভাবে খাট থেকে দরজা পর্যন্ত। আবার দরজা থেকে খাট পর্যন্ত এনে শ্যামলী পলাশকে ধীরে-ধীরে বসিয়ে দিয়ে বললে, "কী বুঝলি? খুব কষ্ট হল?"

পলাশ বললে, "বিশ্বাস করো, মনে হচ্ছিল, শিরাটিরা সব ছিঁড়ে যাবে। অসম্ভব [illegible] লাগছিল। এক-একটা পা ফেলছি আর মনে-মনে [illegible], 'শ্যামলী আমাকে বলেছে, পারতেই হবে, পারতেই হবে।'

"তোর সেই মালিশটা কোথায় আছে?"

"পায়ের মালিশ! কী করবি?"

"বল না, কোথায় আছে?"

"ওই তো আলমারিতে রয়েছে। নীলমতো শিশি।"

শ্যামলী শিশিটা বের করে এনে পলাশের পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসল।

"তুই আমার পায়ে মালিশ করবি নাকি!"

"হ্যাঁ, পা'টা বেশ করে ডলে দেব। তোর শিরার টান আমি সহজ করে দেব।"

"আমার পায়ে তোকে কিছুতেই হাত দিতে দেব না।"

"দেখিস। আমি তোর কত বড় গুরুজন। নে, পা'টা সোজা কর।"

"আমি পারব না।"

"এইবার ঠাস করে তোকে একটা চড় লাগাব।"

"ও মা, সে কী রে!"

"হ্যাঁ বাবা, তাই রে। আমাকে তুই চিনিস না। সাঙ্ঘাতিক মেয়ে।"

"তা বলে গুরুজনকে ঠাস করে চড় মারবি!"

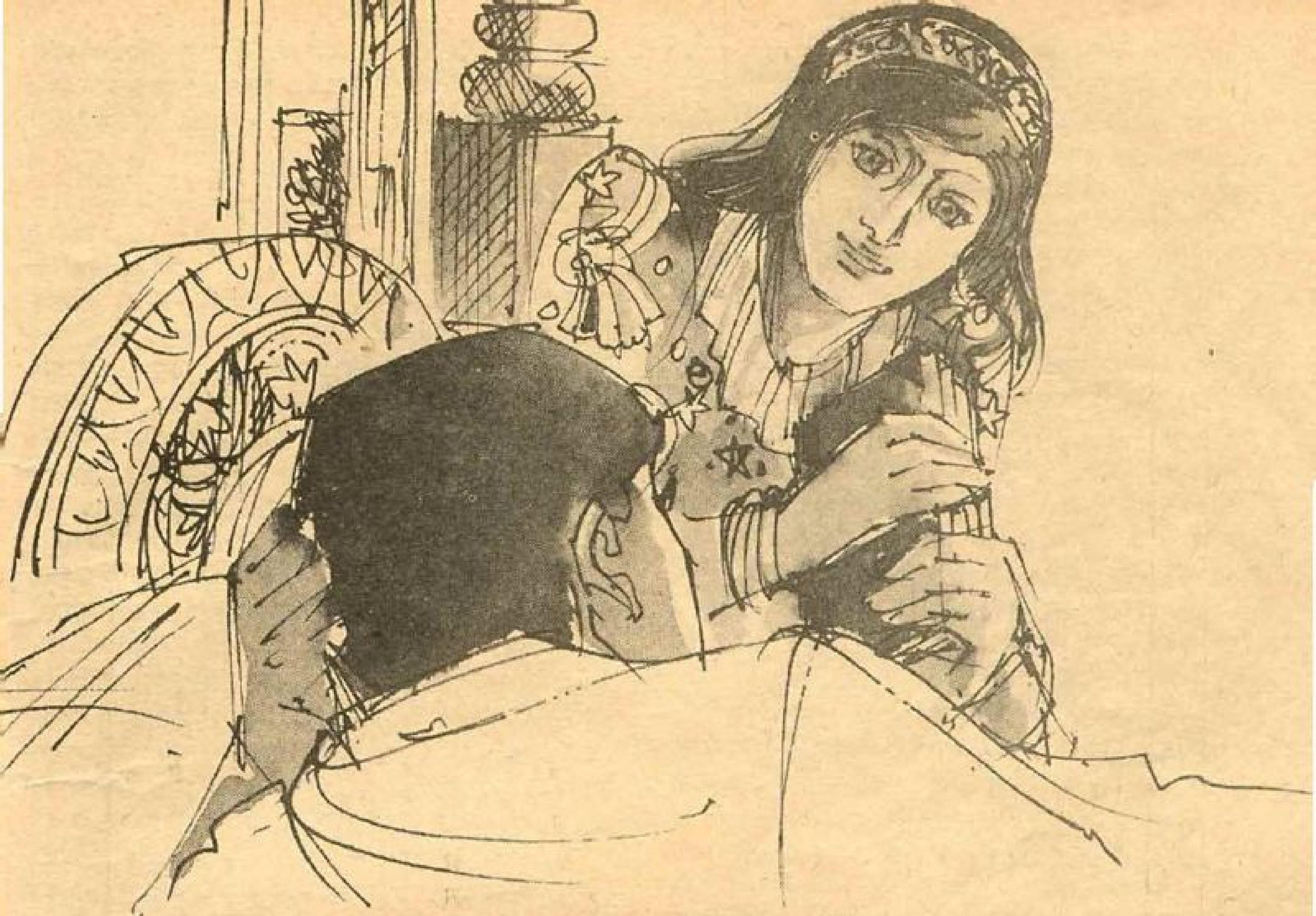

"অ্যা ব্যাবা, গুরুজন ! কী আমার গুরুজন রে ! তোর আর আমার এক বয়েস !"

"আমি তোর চেয়ে এক মাসের বড়। তুই ডিসেম্বরে এসেছিস। সেই বছরই আমি এসেছি নভেম্বরে।"

"এক মাসে গুরুজন হয় না। তিন-চার বছর আগে এলে তবু কথা ছিল। এখন দয়া করে তোমার শ্রীচরণটা বাড়াও।"

দরজার বাইরে ঝিনঝিন্ করে সেতার বেজে উঠল। পলাশ আর শ্যামলী দু'জনেই অবাক। বিমানদাদু। বিমানদাদু এসেছেন। হাতে আড়াআড়ি ধরা ঝকঝকে একটা সেতার। দরজার ঠোক্কর বাঁচিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বিমানদাদু গেয়ে উঠলেন, "আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি।"

সাদা ধপধপে পাঞ্জাবি। ধপধপে সাদা পাজামা। কী সুন্দর যে দেখাচ্ছে বিমানদাদুকে।

"এই নাও পলাশ, তোমার সেতার। তুমি কে গো মহামায়া ?"

শ্যামলী বললে, "আমি পলাশের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ি। আমার নাম শ্যামলী।"

"তুমি শ্যামলী কী গো, তুমি তো গৌরী। আমার বউমা কোথায়, বউমা।"

সেতারটা সাবধানে বিছানায় শুইয়ে রেখে বিমানদাদু আবার হাঁকলেন, "বউমা।"

পলাশ ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। পায়ের কথা ভুলে গেছে। তরতর করে দরজার দিকে হেঁটে গেল, মা'কে ডাকতে। ঘরের মাঝামাঝি গিয়ে যেই পায়ের কথা মনে পড়ল, অমনি বসে পড়ল যন্ত্রণায়।

বিমানদাদু আর শ্যামলী এগিয়ে গেল। বিমানদাদু বললেন, "নিজেই দেখলে, তোমার পা কিন্তু ঠিক হয়ে গেছে। যন্ত্রণা, ব্যথা সব তোমার মনে। শুধু ভুলতে হবে। ভুলতে হবে, একটা দুর্ঘটনা হয়েছিল।"

পলাশের মা শোভনা বুনতে বুনতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এতক্ষণে উঠে এসেছেন। মেঝে থেকে ছেলেকে দু-হাত ধরে তুলতে তুলতে বললেন, "তুই এখানে বসে আছিস এইভাবে ! কী হয়েছে ! এলি কী করে !"

শ্যামলী বললে, "ও হাঁটতে পারছে কাকিমা। সুন্দর হাঁটছে। টকটক করে হাঁটছে। কী মজা !"

শ্যামলী আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল।

শোভনা হাসতে-হাসতে বললেন, "পাগলি মেয়ের আনন্দ দ্যাখ ! আপনি কখন এলেন বাবা !"

"এই তো, এইমাত্র এলুম। পলাশের সেতারটা নিয়ে এলুম। তুমি মা, একটা কিছু মেঝেতে পেতে দাও তো ! যন্ত্রটা নিয়ে একটু বসি। আজ পলাশের হাতেখড়ি হবে।"

মেঝেতে মোটা শতরঞ্চি পাতা হল। বিমানদাদু একটা ধূপ জ্বালিয়ে দিলেন। ধূপ আর দেশলাই তাঁর কাঁধের ঝোলায় ছিল। বাইরে কিছু খান না, এমনকী জলও না। ঝোলায় জলের বোতল আছে তোয়ালে জড়ানো। আর একসেট পাজামা-পাঞ্জাবি আছে। ছোটখাটো একটা সংসার আছে ঝোলায়। বিমানদাদু যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন, তখন এই ভেবে বেরোন: আর ফিরতে না-ও পারি। মন যদি বলে, অমুক জায়গায় চলো, তো চললেন সেখানে। এরকম কতবার হয়েছে ! হঠাৎ ট্রেনে চড়ে বসলেন, সোজা হরিদ্বার। কী আছে ! এত বড় পৃথিবী। দেশে দেশে মোর ঘর আছে।

মেঝেতে সবাই বসেছে। বিমানদাদু ঝকঝকে সেতারটা তুলে নিলেন। সব কটি তারের ওপর দিয়ে অদ্ভুত কায়দায় একবার আঙুল চালালেন, আর সঙ্গে সঙ্গে কুঁচো-কুঁচো সুর মিছরির

দানার মতো সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ল।

"পলাশ দেখে নাও, এইভাবে বসতে হয়। এদিকে ঘাড় আর কাঁধ আর এদিকে পায়ের পাতা। এই দুটো তোমার সাপোর্ট। এই দ্যাখো, হাত ছেড়ে দিলেও পড়বে না। যন্ত্রটা ঠিকমতো ধরার ওপরেই তোমার বাজনার ভাল-মন্দ। আজ তোমাকে কেবল শোনাব। শুনিয়ে যাব। তুমি বুঝবে মানুষের এই আঙুল, যন্ত্রের তার থেকে কী বের করতে পারে। সন্ধে হয়ে আসছে। আমি বাজাব ইমন; অবাঙালিরা বলেন, ইয়ামন। বড় মিষ্টি সুর। সব রাগ-রাগিণীই তার নিজের নিজের রাস্তায় চলে। সুরের রাস্তা। কেউ লাফিয়ে-লাফিয়ে চলে শিশুর মতো। কেউ ঘুরে-ঘুরে চলে। কেউ চলতে-চলতে পিছিয়ে এসে আবার এগিয়ে যায়। বড় মজা পলাশ। বড় মেজাজের জিনিস।"

বিমানদাদু চোখ বুজে রাগের আলাপ শুরু করলেন। বাজাতে বাজাতে আকাশের সব আলো মুছে গিয়ে অন্ধকার গাঢ় হয়ে এল। ঘরে-ঘরে দীপ জ্বলে উঠল। দু-একটি বাড়ি থেকে ভেসে এল শাঁখের শব্দ। পলাশ, শ্যামলী, শোভনা, তিনজনেই বুঁদ। স্তব্ধ প্রতিমা। বিমানদাদু আপনমনেই বাজিয়ে চলেছেন। পলাশ কিছুই বোঝে না, তবু তার ভেতরটা কেমন যেন মুচড়ে মুচড়ে উঠছে। শ্যামলীর ভীষণ কান্না পাচ্ছে। শোভনার মনে পড়ছে ছেলেবেলার কথা। বাবা-মা, ভাই-বোন।

তিনবার তেহাই মেরে, বিমানদাদু সেতার নামিয়ে রাখলেন সাবধানে। এখনও যেন বাজছে। বেজে চলেছে। মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন। তারপর ঘুম-ঘুম নেশালাগা চোখে বললেন, "সুর প্রতিষ্ঠা হল আজ এই বাড়িতে। ধরে রাখার চেষ্টা কোরো। সুর হল দেবী, সুর হল শান্তি, আনন্দ, সৌভাগ্য। এই বাড়ির প্রতিটি ইটের খাঁজে-খাঁজে, কণায়-কণায় সুর ঢুকিয়ে দাও। বউমা, আজ আমি উঠি। কাল এসে শেখাব। সপ্তাহে আমি দু'দিন আসব। ধরো, এই পাঁচটা থেকে ছ'টার মধ্যে। তুমি, বউমা, এর একটা চাকা তৈরি করে দিও। সাবধানে রেখো।'

পলাশ প্রণাম করল বিমানদাদুকে।

"জয়ী হও। প্রতিষ্ঠিত হও জীবনে। দশটা বছর চেপে সাধনা করে যাও। তারপর একদিন আমার পলাশকুমার আসরে বসবে। সামনের আসনে অসংখ্য শ্রোতা। মধ্যরাত। তুমি ধরেছ বেহাগ। সবাই যেন আসনে আটকে গেছে। আমার তৈরি যন্ত্র যার যার কাছে আছে, তারা কেউই এর অমর্যাদা করেনি। করতে পারেনি। নেশা আছে। জাদু আছে। তোমার বাবা তো এলেন না এখনও।"

শোভনা বললেন, "আজ তো পড়াতে যাবার দিন। ফিরতে একটু রাতই হবে।"

বিমানদাদু শ্যামলীর মাথায় হাত রেখে জিজ্ঞেস করলেন, "তোর কিছু শিখতে ইচ্ছে করে না পাগলি?"

"আমার গান শিখতে ইচ্ছে করে।"

"তা শেখ। দেরি করছিস কেন! জীবনে যা নিয়ে বাঁচতে হবে, তা এইবেলা সব জোগাড় করার ব্যবস্থা কর।"

শ্যামলী মাথা নিচু করে রইল। বাবা-মা কেবল পড়া-পড়াই করেন। তার গান শিখতে ইচ্ছে করে, ছবি আঁকা শিখতে ইচ্ছে করে। না, না পড়ার ক্ষতি হবে। কী করবে শ্যামলী।"

ঝোলা কাঁধে উঠে দাঁড়ালেন বিমানদাদু। যেতে-যেতে বললেন, "কাল আসিস।"

শ্যামলী বললে, "আমরা যে কাল বাইরে যাচ্ছি, কয়েকদিনের জন্য।"

"বেশ, পরে আসিস। তোকে আমি ক্লাসিক্যাল শেখাব। দেখবি, সুরের কী মজা! কী নেশা!" বিমানদাদু আপনমনে গান গাইতে গাইতে চলে গেলেন, "চলো মন গঙ্গা-যমুনা তীর।"

৩

আজ যেন অনেক রাত হচ্ছে। অন্যদিন তো শম্ভুনাথ ফিরে আসেন এতক্ষণ। পাড়া-প্রতিবেশীরা জানলা-দরজা বন্ধ করে আলো নেবাতে শুরু করেছে। তবু বাবা কেন আসছেন না। পলাশ ছটফট করছে। শোভনা ঠায় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। শেষ বন্ধ হয় স্যাকরার দোকান। অক্ষয়বাবুও প্রদীপ নিবিয়ে ব্লোপাইপ রাখতে-রাখতে পলাশের বাড়ির দিকে তাকালেন। দরজার পাশে ঘোমটা টেনে শোভনা দাঁড়িয়ে আছেন দেখে দোকান থেকে নেমে এলেন। ভদ্রলোকের বেশ বয়স হয়েছে। একমাথা চুল, সব পেকে সাদা হয়ে গেছে। লম্বা মানুষ। একহারা চেহারা। সামনে সামান্য ঝুঁকে হাঁটেন।

শোভনার সামনে এসে ফিসফিস করে বললেন, "কী হয়েছে বউমা? এত রাতে এখানে একা দাঁড়িয়ে?" খুব আস্তে-আস্তে কথা বলেন অক্ষয়বাবু। শোভনা বললেন, "ও যে এখনও ফেরেনি।"

"কে, শম্ভুনাথ? সে কী! দেরি হবে বলে গিয়েছিল কি?"

"না, কিচ্ছু বলে যায়নি।"

"খুব চিন্তার কথা। দিনকাল ভাল নয়। কী করা যায় এখন! দেখি, দোকানে আগে তালা লাগাই।"

গোটাদশেক তালা লাগাতে বেশ সময় লাগল। সামনের রাস্তা একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল। অক্ষয়বাবু সেইরকম ফিসফিস করে বললেন, "কোথায় কোথায় যেতে পারে আমাকে সব ঠিকানা দাও, আমি একে-একে সব জায়গা দেখি।"

"এত রাতে আপনি একা কোথায় যাবেন?"

"আমার আবার রাত বউমা! আমি তো রাতজাগা পাখি। আর ভয়! তোমরা তখন অনেক ছোট বউমা, সেই সময় আমার ফর্মা তো তোমরা দ্যাখোনি! ছেচল্লিশের রায়টে এই পাড়া এক-একটা লোক সামলেছিল। সে এই অক্ষয়। দু'চারটে পাপ কাজও করেছি বাধ্য হয়ে। একজন ছাড়া আমি আর কাউকে ভয় পাই না। সেই একজন হল, মহাকাল। বলো, বলো, প্রথমে কোথায় যাব বলো।"

দু'জনেরই কথা বন্ধ হয়ে গেল। দূর থেকে হেডলাইট জ্বেলে একটা বড়সড় গাড়ি আসছে। ভ্যানট্যান হবে। আর একটু কাছে আসতেই অক্ষয়বাবু বললেন, "কী হল, পুলিশের গাড়ি মনে হচ্ছে।"

শোভনার বুকটা ছাঁত করে উঠল।

গাড়িটা তাদের সামনাসামনি এসে থেমে পড়ল। ড্রাইভারের পাশ থেকে একজন পুলিশ-অফিসার লাফিয়ে নেমে এসে তরতর করে চলে গেলেন গাড়ির পেছনে। পেছনের দরজা খুলে ধরে বললেন, "নেমে আসুন স্যার। আমার হাত ধরুন। তিনটে স্টেপস।"

শম্ভুনাথ সাবধানে নেমে এলেন। ক্লান্ত গলায় বললেন, "তুমি ভেতরে আসবে না?"

"না, মাস্টারমশাই। আমি অন ডিউটি। বাড়ি তো চিনে গেলুম, আর-একদিন আসব।

"বউমাকে এনো।"

"আচ্ছা।"

গাড়ি চলে গেল। শম্ভুনাথ এগিয়ে আসতে আসতে বললেন, "খুব চিন্তায় পড়েছিলে অক্ষয়দা?"

"তোমার এত্ত দেরি হল! এ কী চেহারা! জামাটা ছিড়লে কী করে!"

শম্ভুনাথ কিছু-একটা বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ টাল খেয়ে দরজার কাঠটা ধরে ফেললেন। শোভনা এগিয়ে এসেছেন। ছুটে এসেছেন অক্ষয়দা। দু'জনে দু'দিক থেকে ধরলেন। শম্ভুনাথের শরীরে সাড় নেই। কেমন যেন বেহুঁশমতো হয়ে গেছেন।

একদিকে অক্ষয়বাবু আর-একদিকে শোভনা, দু'জনে অতিকষ্টে মানুষটিকে ঘরে এনে খাটে শুইয়ে দিলেন। অক্ষয়বাবু বললেন, "বউমা, তুমি ভয় পেয়ো না। সারাদিনের ক্লান্তি আর রোদে এই অবস্থা হয়েছে। তুমি একটা তোয়ালে ভিজিয়ে আনো।"

শোভনা বললে, "দাদা, জামার অবস্থা দেখেছেন! ছিড়ে ফালাফালা। শুধু ক্লান্তি নয়, অন্য কিছু হয়েছে। দেখলেন না, পুলিশের গাড়িতে এল।"

"তুমি ঘাড়ে কপালে ভিজে তোয়ালে দাও। আমি একজন ডাক্তার পাই কি না দেখি।"

দেখতে দেখতে জ্বর এসে গেল। ধুম জ্বর। গা একেবারে পুড়ে যাচ্ছে। পলাশ পাশের ঘর থেকে এ-ঘরে আসার চেষ্টা করছে অনেকক্ষণ। তখন হেঁটেছিল, এখন আর পা পাততে পারছে না। শিরায় টান ধরে, সারা শরীর ঝনঝন করে উঠছে। যেন কারেন্ট খেলে যাচ্ছে। শেষে সে বসে-বসে এ-ঘরে এল।

"বাবার কী হয়েছে মা?"

হুহু করে পাখা ঘুরছে। শম্ভুনাথ চিত হয়ে বিছানায় পড়ে আছেন। শোভনা কোনওরকমে জামাটা খুলে দিতে পেরেছেন।

"কী জানি বাবা কী হয়েছে। এলেন তো পুলিশের গাড়িতে। একটা না দুটো কথা বলেই অজ্ঞান হয়ে গেলেন।"

রান্নাঘরে একটা বেড়াল ডেকে উঠল মিঁউ করে। শোভনা ছেলেকে বললেন, "এই রে, টেঁপি এসেছে।"

এ-বাড়ির পোষা বেড়াল। যখন ছোট ছিল, তখন নাম ছিল পুসি। আদরে এখন বেশ মোটাসোটা। তাই নাম পালটে গিয়ে হয়েছে টেঁপি। সকালে খেয়েদেয়ে চরতে বেরিয়ে গিয়েছিল। এখন আবার খেতে এসেছে। আবার আদুরে ডাক শোনা গেল, মিঁউ।

"পলাশ তুই একটু বাবার কাছে বোস। আমি চট করে বেড়ালটাকে খেতে দিয়ে আসি।"

পলাশ বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কপালে পাট করা ভিজে তোয়ালে। ধারালো মুখ। খাড়া নাক, সামনে অল্প একটু বাঁকা। 'আমার বাবা'। পলাশের চোখে জল এসে গেল।

অক্ষয়বাবু ঠিক ডাক্তার ধরে এনেছেন। ডক্টর কুমুদ অধিকারী। নামকরা চিকিৎসক। তিনি নানাভাবে শম্ভুনাথকে পরীক্ষা করতে লাগলেন। ক্রমশই তাঁর মুখ গম্ভীর হচ্ছে। শেষে পায়ের তলায় টিনের কৌটোর ঢাকনা ঘষলেন। বেশ কয়েকবার, তারপর চেয়ারে বসে উদাস হয়ে রইলেন বেশ কিছুক্ষণ।

অক্ষয়বাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কী বুঝছেন ডাক্তারবাবু?"

"ভাল না।"

"ভাল না?"

"মিথ্যে সাহস দিয়ে লাভ নেই, মনে হচ্ছে সেরিব্র্যাল অ্যাটাক। এইভাবে এক মাস থাকতে পারেন, আবার তিনদিনেও চলে যেতে পারেন।"

"ভাল হবার আশা নেই?"

"খুব কম। পারলে ভাল কোনও হাসপাতালে ব্যবস্থা করুন। বাড়িতে হবে না।"

শোভনার মুখে কথা নেই। পলাশ হতভম্ব। অক্ষয়বাবু ডাক্তারকে গাড়িতে তুলে দিতে গেলেন। বেড়ালটার খাওয়া শেষ। গুটি-গুটি এ-ঘরে এসে আদুরে গলায় মিউ করে একবার ডাকল। তারপরে টুক করে খাটে উঠে গিয়ে শম্ভুনাথের গায়ে গা লাগিয়ে আরাম করে শুয়ে পড়ল। পলাশের বাবা বেড়ালটাকে ভীষণ ভালবাসতেন।

শোভনা হঠাৎ বলে উঠলেন, "পলাশ, তোকে হাঁটতে হবে। যেভাবেই হোক হাঁটতে হবে। আমরা পড়ে গেছি। তোর বাবা বলতেন, 'হেরে গেলে চলবে না।' তোকে হাঁটতে হবে। পা দিয়ে না পারিস, মন দিয়ে হাঁটতে হবে।"

অক্ষয়বাবু ফিরে এলেন। খাটের পাশে বসে শম্ভুনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললেন, "আমার ছেলের মতো। আমি অশিক্ষিত, সোনার ব্যবসা করি বলে কখনও অশ্রদ্ধা করেনি। আমি যে বড়কত্তার বন্ধু ছিলুম। আচ্ছা, তা হলে হাসপাতালের ব্যবস্থা করি। একটু ধরাধরি করতে হবে। এই রাতে কাকে কোথায় পাই?"

অক্ষয়বাবু আবার বেরিয়ে এলেন মাঝরাতের রাস্তায়। একজন নেতা না ধরলে হবে না। প্রশান্ত এবার কাউন্সিলার হয়েছে। ছেলেটা পরোপকারী। অক্ষয়বাবু হাঁটছেন আর ভাবছেন, 'কাল সকালে একবার খোঁজ করতে হবে, ব্যাপারটা কী! কে জামা ছিড়েছে! কোনওরকমে মারধোর করেছে কি না! যদি করে থাকে, তার ক্ষমা নেই। আমি অক্ষয়। বয়েস হয়েছে ঠিকই, তবে এখনও শক্তি রাখি। শয়তানকে শায়েস্তা করার কায়দা আমার জানা আছে।'

মা আর ছেলে মাথার কাছে রাত জাগছে। সময় ক্রমশই এগিয়ে চলেছে। একটু পরেই ভোর হবে। সম্পূর্ণ অন্য ভোর। পলাশের বাবার স্তোত্রপাঠ শোনা যাবে না। পড়াতে যাবার, স্কুলে যাবার তাড়া থাকবে না। 'শোভনা ওঠো, পলাশ ওঠ, ভোর হল' বলে কেউ ডাকবে না।

পলাশ খাট থেকে নেমে পড়ল।

মা জিজ্ঞেস করলেন, "কী করবি! যাচ্ছিস কোথায়?"

"আমাকে হাঁটতে হবে মা। আমি আজ যেভাবেই হোক, সারারাত হাঁটব। এ-পায়ে হাঁটা যদি না যায়, পা আমি কেটে ফেলব।"

বহু দূরে, ভটভট, ফটফট করে বিশাল একটা শব্দ হচ্ছে। রাত একবারে কেঁপে উঠছে। সমস্ত স্তব্ধতা ছিঁড়েখুঁড়ে শব্দটা ক্রমশই এগিয়ে আসছে এইদিকে। এত রাতে মোটরবাইকে করে কে আসছে! পলাশদের বাড়ির সামনে বাইক থামল।

শোভনা অস্পষ্ট গলায় বললেন, "কে এল! আমার ভীষণ ভয় করছে।"

পলাশ খোঁড়াতে-খোঁড়াতে, ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেল। লাগছে, শরীর ছিঁড়ে যাবার মতো হচ্ছে। যাক, পলাশ আর গ্রাহ্য করে না। দরজা খুলে অবাক হয়ে গেল পলাশ। বিমানদাদু, তাঁর রয়্যাল এনফিল্ড মোটরবাইক থেকে নেমে, একপাশে বাইকটাকে খাড়া করে রাখছেন। মালকোঁচা-মারা ধুতি, হাফহাতা পাঞ্জাবি, কাঁধে সেই

ঝোলা। এত বড় মোটরবাইক শহরে আর কারও নেই। অনেক আগে পলাশকে একদিন বলেছিলেন, 'এ হল আমার আফ্রিকান রাইনো, ফিফটিন সিলিণ্ডার।'

গাড়ি রেখে, ভেতরে এসে বিমানদাদু বললেন, "পলাশ কাঁদবে না!"

বিমানদাদুকে দেখে পলাশ কেঁদে ফেলেছিল। চোখের জল সামলাতে পারেনি। ধরা-ধরা গলায় বললে, "আপনি জানেন দাদু!"

"সবটা জানি না, তবে তোমাদের একটা কিছু হয়েছে, এ আমি টের পেয়েছি রাত দেড়টায়।"

পলাশের ইচ্ছে করছিল প্রশ্ন করে, কীভাবে জানলেন। করা হল না। বিমানদাদু বড়-বড় পা ফেলে ভেতরের ঘরে চলে গেলেন। শম্ভুনাথের কপালে হাত রাখলেন। শোভনার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সারা ঘরটা দেখে নিলেন। কোনও কথা নেই মুখে। ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। পলাশকে বললেন, "আমার সঙ্গে এসো।"

পলাশের অসহায় অবস্থা। ভেতরটা কেমন করছে, অথচ কাঁদতে পারছে না। মা কেমন যেন হয়ে গেছেন। পলাশ জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাব দাদু?"

"বাইরে এসো। রকে বসি কিছুক্ষণ।"

"বাবার জন্যে কিছু করবেন না।"

"বাইরে চলো, বলছি।"

"পলাশ হাঁটতে পারছে না। কোনওরকমে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে বিমানদাদুর পেছন-পেছন বাইরের রকে এল।

"আমার পাশে বোসো। রাত দ্যাখো। আজ অমাবস্যা। তাই এত অন্ধকার।"

বিমানদাদুর কথা শুনে পলাশ অবাক হয়ে গেল। এই কি রাতের অন্ধকার দেখার সময়। বিমানদাদু পলাশের কাঁধে হাত রাখলেন। একটু দূরে বিশাল মোটরবাইকের হাতল, পেট্রল-ট্যাঙ্ক, হেডলাইট, এপাশ-ওপাশের চোরা আলোয় চকচক করছে।

বিমানদাদু বললেন, "আমি পুজোয় বসেছিলুম। বুঝলে পলাশ।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"পারলুম না, উঠে পড়তে হল। যতবার চোখ বুজোই, চোখের সামনে ভেসে ওঠে তোমার বাবার মুখ। তোমাকে একটা কথা বলব?"

"বলুন!"

"পলাশ ভেঙে পোড়ো না। মন শক্ত করো। কাল সকালে কী হবে কেউ জানে না।"

পলাশ কেঁদে ফেলল। বাবা চলে গেলে সে কেমন করে বাঁচবে। একটা পা ভাঙা। ভাল করে হাঁটতে পারে না। কীভাবে বাঁচবে! কে তাকে বসিয়ে-বসিয়ে খাওয়াবে! কে চালাবে তার স্কুল-কলেজের খরচ!

বিমানদাদু বললেন, "তুমি পুরুষ মানুষ। আমি তোমাকে শক্ত হতে বলেছি। একটা কথা জেনে রাখো, আমি এখনও অনেক বছর আছি। তোমার জন্যেই আছি।"

পলাশ কিছুতেই নিজেকে শক্ত করতে পারছে না। হুহু করে কান্না বেরিয়ে আসছে। বিমানদাদু পলাশকে বুকে টেনে নিয়েছেন।

"শোনো পলাশ, একদিন আমার জীবনেও তোমার মতো বয়সেই দুর্যোগ নেমে এসেছিল। কেউ দেখার ছিল না। পাশে এসে দাঁড়াবার মতো কেউ ছিল না। একেবারে একা। সেই অবস্থা থেকে আমাকে ঠেলেঠুলে উঠতে হয়েছে। কী করা যাবে বলো! যাঁর নির্দেশে জীবন চলছে, তাঁর কাছে তো কোনও আর্জি চলবে না। মানুষের অনুরোধ তাঁর কানে ঢোকে না।"

অ্যাম্বুলেন্স আসছে। মাথার ওপর লাল আলো ঘুরছে। অক্ষয়দা ঠিক ব্যবস্থা করে এনেছেন। অ্যাম্বুলেন্স থামল। পেছনের দরজা খুলে দু'জন লাফিয়ে পড়ল। স্ট্রেচার বের করল টেনেটুনে।

বিমানদাদু বললেন, "কী হবে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে। কেন পাঠাচ্ছ। কেন সরিয়ে দিচ্ছ মানুষটিকে!"

পলাশ কী উত্তর দেবে!

বিমানদাদু জিজ্ঞেস করলেন, "ওই লম্বামতো ভদ্রলোকটি কে?"

"অক্ষয়দা। ওই যে আমাদের বাড়ির সামনে সোনা-রুপোর দোকান।"

বিমানবাবু এগিয়ে গেলেন, "অক্ষয়বাবু, শুনুন।"

স্ট্রেচারবাহী লোক দু'জন আর অক্ষয়বাবু এগিয়ে এলেন।

"কেন হাসপাতালে পাঠাচ্ছেন?"

"তার মানে? বাড়িতে তো ঠিক চিকিৎসা হবে না। কী হয়েছে জানেন?"

"সব জানি।"

"তবে! হাসপাতাল ছাড়া উপায় কী?"

"ক'টা বাজল?"

"তা দুটো হবে।"

"দু' ঘণ্টা পনেরো মিনিটের জন্যে টানাহ্যাঁচড়া করে লাভ কী?"

"সে আবার কী কথা!"

"চারটে পনেরো মিনিটে যাবার সময়।"

যাঁরা স্ট্রেচার বইছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, "ভগবান নাকি! সব জেনে বসে আছেন। এসব কেসে এই অবস্থায় কেউ-কেউ তিন মাসও থাকেন। অনেক সময় ভালও হয়ে ওঠেন, তবে একটা অঙ্গ হয়তো পড়েও যায়।"

বিমানদাদু আবার বললেন, "চারটে পনেরো।"

স্ট্রেচারবাহী ভদ্রলোক এবার বিরক্ত হয়ে বললেন, "ধ্যার মশাই, এই জ্যোতিষীরাই আমাদের দেশের বারোটা বাজিয়ে দিলে। সাপ্তাহিক রাশিফলের জায়গায় এখন আবার দৈনিক রাশিফল হয়েছে। রাত দুটোর সময় এইসব ভ্যানতাড়া আর ভাল লাগে না।"

বিমানদাদু কোনও উত্তর দিলেন না। সবাই ধরাধরি করে শম্ভুনাথকে স্ট্রেচারে শোয়ালেন। শোভনা অনবরত আঁচলে চোখ মুছে চলেছেন। পলাশ একপাশে দাঁড়িয়ে আছে স্থির হয়ে। কী যে হচ্ছে, কী যে হবে কিছুই জানা নেই। তবে এইটুকু বুঝেছে, জীবনের খারাপ দিন শুরু হল। দুঃসময়।

হঠাৎ তার ডান পায়ে প্রচণ্ড জোরে কী একটা এসে লাগল। পা থেকে মাথা পর্যন্ত সারা শরীর ঝনঝন করে উঠল। মুখ কুঁচকে চোখ বুজে ফেলতে ফেলতে তার যেন মনে হল, বিমানদাদু সজোরে তার পায়ে লাথি মেরেছেন। অসম্ভব ব্যাপার; কিন্তু সেই অসম্ভবই ঘটেছে। দাদু কি পাগল হয়ে গেলেন!

চোখ বুজে যন্ত্রণা সহ্য করতে করতে পলাশ শুনল, বিমানদাদু বলছেন, "আর কোনও উপায় ছিল না পলাশ।

তোমাকে হাঁটতে হবে। সামনে তোমার দীর্ঘ পথ। তুমি একা সেই পথের যাত্রী।"

যন্ত্রণার প্রথম ঢেউটা মিলিয়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গেই পলাশের মনে হল, তার পায়ের টান-ভাবটা কেটে গেছে। বেশ হালকা লাগছে। তা হলে তার পা'টা কি সত্যিই খুলে গেল! ভাল হয়ে গেল তার পা!

বিমানদাদু বললেন, "হেঁটে দ্যাখো। মনে হয়, সহজেই হাঁটতে পারবে। চলো আমার সঙ্গে। যাবে তো হাসপাতালে?"

পলাশ আগের মতো গটগট করে হাঁটতে পারছে। ভীষণ আনন্দ হচ্ছে তার। মোটরবাইকের পেছনে উঠে বসতে-বসতেই আনন্দ মিলিয়ে গেল। বাবার চেহারা ভেসে উঠছে চোখের সামনে। আজও আছেন, কাল হয়তো আর থাকবেন না।

কলকাতার নির্জন নৈশপথ ধরে ঝড়ের বেগে বাইক ছুটছে। পলাশ জিজ্ঞেস করল, "কোন্ হাসপাতাল দাদু?"

"তুমি জানো না?"

"না তো!"

"তা হলে কাজ বাড়ল। সব ক'টা হাসপাতাল ঘুরতে হবে। প্রথমে আমরা এন আর এস-এ যাই চলো। মনে হয়, ওইখানেই গেছেন।"

"দাদু আমার পা'টা হঠাৎ কী করে ছেড়ে গেল!"

"আচমকা ধাক্কায়! ইংরেজিতে একেই হয়তো বলে—শক-থেরাপি।"

"আবার আগের মতো হয়ে যাবে না তো!"

"মনে হয় না।"

সামনের অন্ধকার থেকে গোটা-চারেক ছায়ামূর্তি হঠাৎ বেরিয়ে এল। বিমানদাদু বললেন, "ভাল করে আমার কোমর জড়িয়ে ধরো। ডেঞ্জার অ্যাহেড।"

লোক চারটে মারবার জন্যে মাথার ওপর ডাণ্ডা উঁচিয়েছে। এপাশে দু'জন, ওপাশে দু'জন। মাঝখান দিয়ে যেতে হবে। বিমানদাদু ঝড়ের বেগে রাস্তার একেবারে বাঁ পাশে চলে গেলেন, বাঁ দিকের লোক দুটোর পেছনে। তারা ঘোরার আগেই বিমানদাদু ডান পা'টা চালিয়ে দিলেন। অব্যর্থ লক্ষ। ছিটকে পড়ে যাবার শব্দ শুনল পলাশ। বিপদের এলাকা ছাড়িয়ে তারা বেশ কিছুটা চলে এসেছে। একটা লোহার ডাণ্ডা ছুঁড়েছিল। সেটা গড়াতে-গড়াতে খানিকটা এসে একটা গর্তে পড়ে গেল।

শক্ত করে ধরে না বসলে পলাশ এতক্ষণ কোথায় ছিটকে পড়ে যেত। বিমানদাদুর কী ক্ষমতা! রাস্তার ধারের যা অবস্থা ছিল! বড়-বড় গর্ত, পাথরের চাঙড়, ইট, লোহার পাইপ। বিমানদাদু কেমন অনায়াসে টপকে গেলেন। কী সাহস বিমানদাদুর! বিকট শব্দে পেছনে একটা বোমা ফাটল।

বিমানদাদু বললেন, "কী বুঝছ পলাশ! তোমরা কোন্ যুগে এসে পড়লে? এ-যুগে বেঁচে থাকাটাই এক দুঃসাধ্য ব্যাপার!"

"ওরা আমাদের কী করত দাদু?"

"মেরে সব কেড়ে নিত। এই মোটরবাইক এখন আর তৈরি হয় না। অনেক দাম। মজা দেখেছ পলাশ, সেই পুরনো প্রবাদ, 'কারও সর্বনাশ, কারও পোষ মাস।' এক মানুষের বিপদ আর-এক মানুষের মূলধন। স্নেহ-মায়া-মমতা-দয়া ধীরে-ধীরে পৃথিবী থেকে লোপাট হয়ে যাচ্ছে। মন আর দেহ দুটোকেই শক্ত করো পলাশ, ভীষণ শক্ত। জীবনের কাছে হেরে যেয়ো না।"

"আমার বাবাও ঠিক এই কথা বলতেন।"

"তোমার বাবা তো বলবেনই। তিনি কত বড় সংগ্রামী ছিলেন! তোমরা যত না জানো, আমি তার চেয়ে ঢের বেশি জানি। আজ সকালে সেতার নেবার জন্যে তোমার বাবা আমার কাছে এসেছিলেন! ইদানীং তাঁর ধ্যান-জ্ঞান হয়েছিল তোমার পা ভাল করা। আজ কী হয়েছিল জানো? তোমার বাবা কেন

অসুস্থ হলেন জানো ?"
"না দাদু ।"
"তোমার বাবাকে খুন করা হল ।"
"খুন ? আমার বাবাকে কে খুন করবে দাদু ! বাবা তো ভীষণ ভাল লোক ছিলেন ।"
"এ-যুগে ভাল মানুষেরাই খুন হয় । তোমার বাবাকে আজ বেলা বারোটা থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত ছেলেরা ঘেরাও করে রেখেছিল । এক গেলাস জল পর্যন্ত খেতে দেয়নি । বাথরুমে যেতে দেয়নি ।"
"কেন দাদু ?"
"দশটা ওঁচা ছেলেকে ভর্তি করার দাবিতে । মারধোর করার চেষ্টা করেছিল । চেয়ার-টেবিল-জানলা-দরজা-টেলিফোন ভেঙে চুরমার করেছে । গায়ে থুতু দিয়েছে । মাথায় চাঁটি মেরেছে । তোমরা লক্ষ করোনি, চশমা ভেঙে দিয়েছে । এই হল তোমাদের যুগ । এই হল এ-যুগের গুরু-শিষ্য সম্পর্ক ।"
"যারা এমন করেছে তাদের নাম জানা যাবে দাদু ?"
"নাম জেনে কী হবে বলো ! একজন অপরাধ করলে তার সাজা আছে, একসঙ্গে অনেকে করলে, সেটা আর অপরাধ নয়, আন্দোলন । বড় মজার যুগে বাস করছি দাদু ।"
এন আর এসের গেট দিয়ে বাইক ঢুকে গেল । গেটের পাশ থেকে কে একজন বললে, "হসপিটাল, সাইলেন্স ।" বলেই হাহা করে হেসে উঠল পাগলের মতো ।
বিমানদাদু সঙ্গে-সঙ্গে থেমে পড়লেন । মাটিতে ডান পা রেখে পলাশকে বললেন, "আস্তে-আস্তে সাবধানে নেমে পড়ো দাদু । খেয়াল ছিল না । মোটরবাইকের সব ভাল, একটাই দোষ বড় শব্দ হয় !"
দূর অন্ধকার থেকে চার-পাঁচটি ছেলে হাঁটতে-হাঁটতে এই দিকেই আসছে । একজন বলছে, 'বাড়িতে ওর মা'কে খবর দে । বাঁচার কোনও আশা নেই, একেবারে কুপিয়ে ছেড়ে দিয়েছে ।' আর একজন বলছে, 'এর বদলা নিতে হবে ।'
প্যান্ট আর গেঞ্জি-পরা ছ'সাতজন ছেলে, সিগারেট খেতে-খেতে পাশ দিয়ে চলে গেল ।
বিমানদাদু বললেন, "পলাশ, তুমি দু'চার কদম হেঁটে দ্যাখো তো !"
"আমি হাঁটতে পারব দাদু । আমার পা মনে হয় ঠিক হয়ে গেছে ।"
"হয়তো হয়েছে, তবে অনেক দিন হাঁটা-চলা করোনি তো ! অভ্যাসটাকে আস্তে-আস্তে ফিরিয়ে আনতে হবে ।"
ভারী মোটরসাইকেলটাকে ধীরে-ধীরে হাঁটাতে-হাঁটাতে ওঁরা দু'জনে হাসপাতালের আউটডোরের কাছাকাছি আসতেই অক্ষয়বাবুকে দেখতে পাওয়া গেল । চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন একপাশে ।
বিমানদাদু গাড়িটাকে একপাশে দাঁড় করিয়ে রেখে এগিয়ে গেলেন, "কী খবর ? সব ঠিক আছে ?"
"ঠিক আর কী থাকবে বলুন, ভাগ্য ভাল, ওরই এক ছাত্র, এখন ডাক্তার, ডিউটিতে আছে । সেই সব ব্যবস্থা করে এমার্জেন্সি ইন্টেনসিভ-কেয়ারে রেখেছে । কী হবে কিছুই বলতে পারছে না ।"
"অপেক্ষা ছাড়া উপায় নেই ।"
"আপনি তো বলেই দিলেন, ভোর চারটে পনেরো ।"
"আমার হিসেব তাই বলে ।"
"কী করে বলেন এসব ?"
"বলা যায় । মনটাকে একটু স্থির করলে, যে কেউ বলতে পারে , যেমন কান খাড়া রাখলে অনেক শব্দ শোনা যায় ।"
"ডাক্তাররা বাহাত্তর ঘণ্টার আগে কিছু বলতে পারবে না !"
"এইসব কেসে ওরা এই এক কথাই বলে । বাঁধা বুলি ।"
"আমরা তা হলে কী করব এখন ?"
"অপেক্ষা ।"
"তা হলে চলুন, ওই জায়গাটায় বসি ।"
"একেবারে সরাসরি গাছের তলায় না-বসে, আসুন, এই বাঁধানো জায়গাটায় ঝেড়েঝুড়ে বসি ।"
"কেন, গাছে ভূত আছে ?"
"গাছের নিশ্বাস আছে । রাতের নিশ্বাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বেরোয় । রাতে ওই জন্যে গাছতলায় না বসাই ভাল ।"
"এখনও শরীরের কথা ভাবছেন ! একজন মানুষ ওদিকে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে । আমার কাছে মৃত্যুটা অবশ্য কিছুই নয় । জীবনে এত মৃত্যু দেখেছি । হাসতে-হাসতে মানুষ খুন করেছি ।"
"আপনি খুনি ?"
"ওসব আলোচনা থাক । ছেলেটা ভয় পাবে । ওদের জগৎ এখনও বড় কোমল ।"
"ওই অবাস্তব কল্পনার কোমল জগৎ থেকে যত তাড়াতাড়ি বের করে আনা যায়, ততই ওর মঙ্গল । এই পৃথিবী হল দাঁত-কাটা চাকা । জীবনকে ফালাফালা করার জন্যে ঘড়ির চাকার মতো ঘুরছে তো ঘুরছেই ।"
পলাশের এইসব কথা একদম ভাল লাগছে না । সে বললে, "দাদু, আমি চট করে বাবাকে একবার দেখে আসি না ?"
বিমানদাদু বললেন, "এখন যে দেখতে দেবে না দাদু ! নিয়ম নেই ।"
"আমার বাবাকে আমি আর দেখতে পাব না ?"
"কী হবে দেখে ! তুমি শক্ত হও । আর কিছুক্ষণের মধ্যে তোমার কাছে এক সত্য আসবে ধরা দিতে । মহাসত্য ।"
এত সব শক্ত-শক্ত কথা পলাশের ভাল লাগে না । ঠিক বুঝতে পারে না, বড়রা কী বলেন, কী বলতে চান । তার ভীষণ ইচ্ছে করছে, এক দৌড়ে বাবার বিছানার পাশে গিয়ে হাজির হয় । এক-একবার মনে হচ্ছে, সে যদি 'বাবা' বলে ঠিক-ঠিক একবার ডাকতে পারে, তা হলে সাড়া পাবে । তিনি চোখ মেলে উঠে বসবেন ।"
পলাশ এবার খুব করুণ গলায় অক্ষয়বাবুকে বললে, "জেঠু, আমি একবার যাই না জেঠু ।"
অক্ষয়বাবু পলাশের পিঠে হাত রাখলেন, "বাবা, ওরা যতক্ষণ না ডাকছে, ততক্ষণ আমাদের যাবার যে উপায় নেই । রাতে তোমাদের খাওয়া হয়েছিল ?"
পলাশ ঘাড় নেড়ে জানালে, না ।
"ইশ্, সারাটা রাত উপোস করে রইলে । মিষ্টিটিস্টি একটু কিছু খাওয়াতে পারলে হত ?"
বিমানদাদু বললেন, "এখন কিছুই পাবার উপায় নেই । সব বন্ধ ।"
পলাশ বললে, "আমার খিদে নেই, জেঠু ।"
পুলিশের একটা জিপ এসে ঢুকল । হেডলাইটের আলোয় অন্ধকার ফুটো হয়ে গেল । চারজন পুলিশ ধরাধরি করে পেছন থেকে একজনকে নামাল । নিজেদের মধ্যে জোরে-জোরে কথা হচ্ছে । একজন বলছে, "ব্যাটা, মরে গেল !"
আর-একজন বলছে, "ধোলাইটা একটু বেশি জোরে হয়ে

গেল।"

সবাই ধরাধরি করে ছেলেটাকে ভেতরে নিয়ে গেল। জিপের স্টার্ট বন্ধ করেনি। জন্তুর মতো গরগর করছে। জিপটা সোজা অন্ধকারের দিকে এগিয়ে গেল। একটা কুকুর চাপা পড়েছে। কেঁউ-কেঁউ করে অন্ধকার ফালাফালা করছে।

পলাশকে পলাশের বাবা একটা গ্লোব কিনে দিয়েছিলেন। গ্লোবটাকে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখাতেন, পৃথিবী কীভাবে ধীরে-ধীরে ঘুরছে, কীভাবে দিন থেকে রাত হচ্ছে, রাত থেকে দিন। পলাশের মনে হল, যেভাবে হাতল টেনে, ব্রেক কষে চাকা থামায়, সেই ভাবে পৃথিবীর ঘোরাটাকে যদি বন্ধ করা যেত। আজকের রাতটাকে যদি রাতেই আটকে রাখা যেত! চারটে পনেরো যদি আর না বাজত!

পলাশ জিজ্ঞেস করল, "ক'টা বাজল দাদু?"

"সাড়ে তিনটে।"

"আর মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট।"

অক্ষয়জেঠু বললেন, "তুমি ওসব ভেবো না। যা হবার তা হবে, সব ভগবানের হাতে। মানুষের হাতে কিছু নেই। তুমি আমার বুকে মাথা রেখে একটু ঘুমিয়ে নাও।"

"আমার ঘুম আসছে না জেঠু।"

"তা হলে আমাদের একটা গল্প বলো।"

"একবার একটা চোরকে আমার বাবা মাঝরাতে ওমলেট ভেজে চা করে খাইয়ে ছিলেন।"

"অ্যাঁ, সে আবার কী! এমন তো কখনও শুনিনি! বলো, বলো, ব্যাপারটা বলো।"

"গত বছর চোর পড়েছিল আমাদের বাড়িতে। বাবার তো ভীষণ সাহস ছিল। চোরটাকে তিনি ধরে ফেললেন। রোগা, লিকলিকে, কালোমতো একটা ছেলে। বাবার পায়ে পড়ে ভীষণ কাঁদতে লাগল। 'আমাকে ধরিয়ে দেবেন না স্যার। আমি পেটের দায়ে এ-পথে নেমেছি। আমার কেউ নেই স্যার। কত চেষ্টা করেছি, কেউ আমাকে চাকরি দেয় না।'

"বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'তুই কী কী কাজ জানিস? আমি তোকে চাকরি দেব।'

"ছেলেটা বললে, 'আমি পাইপ বেয়ে চারতলা, পাঁচতলা, যত তলা বলবেন উঠে যেতে পারি। যে-কোনও ছিটকিনি বাইরে থেকে খুলে ফেলতে পারি। যে-কোনও তালা ভেঙে ফেলতে পারি।'

"'আর কী পারিস?'

"'গান গাইতে পারি।'

"বাবা বললেন, 'একটা গান শোনা।'

"ছেলেটা একটা সিনেমার গান গাইল। বেশ সুন্দর গলা। গান শেষ করে বলল, 'স্যার,আমাকে থানায় দেবেন না তো?'

"বাবা বললেন, 'কে আবার কষ্ট করে থানায় যায়। তুই কিছু নিসনি তো?'

"ছেলেটা বললে, 'নিয়েছি স্যার, এই যে।' প্যান্টের পকেট থেকে একটা আপেল বের করে দেখাল। তারপর একগাল হেসে বললে, 'ভীষণ খিদে পেয়েছে তো স্যার!'

"বাবা তখন ডিম ভেজে, চা তৈরি করে খাওয়ালেন। দশটা টাকা দিয়ে ভোরবেলা ছেড়ে দিলেন।'

অক্ষয়জেঠু জিজ্ঞেস করলেন, "সেই ভাগ্যবান ছেলেটা এখন কোথায়?"

বিমানদাদু বললেন, "আমার কাছে। আমার সেতার কারখানায় কাজ করে। ছেলেটার মনে সুর আছে। অ-সুরের খপ্পর থেকে বের করে আনতে পারলে মানুষ হয়ে যাবে।"

পলাশ আকাশের দিকে তাকাল। একটু আগে অনেক তারা ছিল। এখন দু'একটা মাত্র জেগে আছে, তাও কেমন যেন ফ্যাকাসে হয়ে এসেছে। পৃথিবী ঘুরছে, অন্ধকার থেকে আলোর দিকে চলেছে ধীরে-ধীরে। পলাশ ভাবল, একটু পরেই সকাল হবে আর তার জীবনে রাত নামবে। কেউ কি নেই যে পৃথিবীর ঘোরাটাকে এক্ষুনি থামিয়ে দিতে পারে?

অক্ষয়জেঠু বললেন, "আমাদের এখন কী করা উচিত? কতক্ষণ এইভাবে বসে থাকা যায়?"

বিমানদাদু বললেন, "আমি বসে আছি অন্য কারণে।"

"জানি, ঘড়ি মেলাবার জন্যে। একটা খারাপ ভবিষ্যৎ-বাণী মেলে কি না দেখার জন্যে অপেক্ষা করে আছেন।"

"আপনার মনে হচ্ছে খারাপ, আমার মনে হচ্ছে ভাল। অমন সুন্দর একটা মানুষ দিনের পর দিন বিছানায় পড়ে থাকবে, এ আমি চাই না। আমি ভাবতেও পারি না!"

দেওয়ালে পিঠ দিয়ে অক্ষয়জেঠু এলিয়ে বসলেন। কলকাতা শহরে এখনও প্যাঁচা আছে। শেষ রাতে বাসায় ফেরার আগে খুব ক্যাচোর-ম্যাচোর করছে। পলাশের মনে হল, ভগবানের কী আশ্চর্য নিয়ম, কাকের যখন ভোর, প্যাঁচার তখন রাত। অনেক এলোমেলো চিন্তা আসছে পলাশের মনে। হঠাৎ মনে হল, মা'কে নিয়ে এলে কেমন হয়?

"দাদু, মা'কে নিয়ে আসব? মা একবার দেখবেন না?"

"অবশ্যই দেখবেন, তবে আরও পরে।"

পলাশের ডান পা'টা আবার যেন দুর্বল হয়ে আসছে। বেশ বুঝতে পারছে, এবার হাঁটতে গেলে পড়ে যাবে। ভীষণ রাগ হচ্ছে নিজের ওপর। বাবা যদি চলে যান, খোঁড়া পা নিয়ে আর-একদিনও সে বাঁচতে চায় না। আত্মহত্যা করবে। মা'কে ছেড়ে সে একদিনও থাকতে পারে না, তবু সে মা'কে ছেড়ে বাবার কাছে চলে যাবে।

চারটে দশ বাজতেই বিমানদাদু আর অক্ষয়জেঠু উঠে পড়লেন। আর পাঁচ মিনিট। রাত আর নেই। গাছপালা, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট ক্রমশই স্পষ্ট হতে শুরু করেছে।

তিনজনে পাশাপাশি হেঁটে চলেছে হাসপাতালের দিকে। ভেতরে এখনও আলো জ্বলছে। ওষুধ-ওষুধ গন্ধ। সামনেই অনুসন্ধান-অফিস। সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই লাল চোখে সিস্টার তাকালেন। অক্ষয়জেঠু জিজ্ঞেস করলেন, "অবস্থা কী?"

সিস্টার না বুঝে, না জেনে উত্তর দিলেন, "সেই একই অবস্থা।"

অক্ষয়জেঠু বললেন, "কার কথা বলছেন?"

সিস্টার ঘুমজড়ানো চোখে পালটা প্রশ্ন করলেন, "কার কথা বলুন তো?"

"ইন্টেনসিভ-কেয়ারে রয়েছেন, সেরিব্রাল অ্যাটাক, শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়।"

সিস্টার ফোন তুলে নিলেন। দেওয়াল-ঘড়িতে ঠিক চারটে পনেরো। পলাশের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। কী হচ্ছে সেই ঘরে! কী অবস্থা! বাবা কি বেঁচে আছেন?

ফোন নামিয়ে সিস্টার বললেন, "সেই একই অবস্থা! বাহাত্তর ঘণ্টা না গেলে…।"

অক্ষয়জেঠু বিমানদাদুকে বললেন, "ঘড়িটা একবার দেখুন মশাই। চারটে পনেরো পার হয়ে গেছে।"

পলাশের আবার নিশ্বাস পড়ছে। চারটে পনেরো পার হয়ে গেছে! বিমানদাদুর হিসেব ভুল। মেলেনি। বাবা বেঁচে আছেন

এখনও।

অক্ষয়জেঠু বললেন, "মানুষের জন্ম-মৃত্যু অত সহজে বলা যায় না। বলতে পারলে মানুষই ভগবান হয়ে যেত। বুঝলেন।"

বিমানদাদু একটা আঙুল তুলে অক্ষয়জেঠুকে থামিয়ে দিলেন, "ওই ঘড়িটা পাঁচ মিনিট ফার্স্ট আছে।"

পলাশ তাকিয়ে দেখল, ঘড়িতে চারটে কুড়ি। আর সঙ্গে-সঙ্গে সিস্টারের ফোন ঝনঝন করে উঠল। কানে রিসিভার লাগিয়ে সিস্টার কী শুনলেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা ওঁর কে হন, পেশেন্ট এইমাত্র মারা গেছেন।"

অক্ষয়জেঠু ধরে না ফেললে পলাশ পড়ে যেত। বাইরে কা-কা করে কাক ডাকছে। পৃথিবী জেগে উঠল আর শম্ভুনাথ ঘুমিয়ে পড়লেন।

৪

নেই। একটি মাত্র শব্দ নেই। অন্য সব কিছু আছে। তিনি নেই। লেখাপড়া করার চশমা রয়েছে খাপে ভরা। রয়েছে জুতোজোড়া। বর্ষার ছাতা। আছে অসংখ্য কঠিন-কঠিন বই। যার অর্ধেকের মানে বুঝবে না পলাশ। আছে জামা-কাপড়। টবে একটা বোগেনভেলিয়া লাগিয়েছিলেন, লাল, টকটকে ফুল ফুটেছে থোকা-থোকা। বাড়ির সামনের রাস্তাটা ঠিক যেমন ছিল, সেইরকমই আছে। রোজ যাঁরা চলাফেরা করতেন, তাঁরাও আছেন। বিশাল চেহারার মুকুন্দবাবু রোজ সকাল আটটার সময় রিকশা চেপে বেরিয়ে যান, আবার ঠিক সাতটার সময় ফিরে আসেন। সেই কত দিনের পুরনো খবরের কাগজওলা বাড়ি বাড়ি হেঁকে যায়, কাবেজ, প্রানা কাবেজ। তিলক-কাটা বোষ্টুমি আসে খঞ্জনি বাজিয়ে। রকে শুয়ে থাকে সেই কালো কুকুরটা।

সব আছে। সবাই আছে। নেই তিনি।

পলাশের ডান পা'টা দিন-দিন সরু হয়ে যাচ্ছে। চেনা-জানা সকলেই একবার করে বলে যায়, 'ভাল ডাক্তার দেখাও। ভাল স্পেশালিস্ট। মনে হয় নার্ভ শুকিয়ে যাচ্ছে। এখনও সময় আছে। এরপর আর কিছু করার থাকবে না।' পলাশ শোনে, পলাশের মা শোনেন। করার কিছু নেই। শম্ভুনাথ টাকা-পয়সা বিশেষ কিছু রেখে যাননি। যা রোজগার করেছেন, সব দু'হাতে খরচ করেছেন। স্কুলে যা পাওনাগণ্ডা ছিল, সব এখন গভীর জলে, কবে পাওয়া যাবে কে জানে!

মৃত্যুর পর স্কুলে শোকসভা হয়েছিল। এত বড় একটা শোক-প্রস্তাব কালো বর্ডার দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়ে গেছেন। চোখের সামনে দেওয়ালে ঝুলছে। খুব কঠিন বাংলায় কায়দা করে লেখা। শিক্ষকমশাইরা সরকারের কাছে নিন্দা-প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। অপরাধীদের সাজা দেবার কথা বলেছেন। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাজনীতি হটাবার কথা বলেছেন তীব্র ভাষায়।

কিছুই হয়নি। কিছু হবে না। খেলতে গিয়ে ক্রিকেট বল লেগে ব্যাটসম্যান মারা গেলে, বোলারের ফাঁসি হয় না। যার লাইসেন্স আছে, সে চাপা দিয়ে মানুষ মেরে ফেললে প্রাণদণ্ড হয় না।

শোভনা কেমন যেন হয়ে গেছেন। কোনও কিছুতেই উৎসাহ নেই। আত্মীয়স্বজন যাঁরা আছেন, তাঁরা প্রথম-প্রথম আসতেন। খোঁজখবর নিতেন। উপদেশ দিতেন। এখন আর তাঁদের দেখা নেই। পলাশ একদিন খোঁড়াতে-খোঁড়াতে পা টানতে টানতে রেশন তুলতে যাচ্ছিল। অক্ষয়জেঠু দোকান থেকে নেমে এলেন, "কোথায় যাচ্ছ? রেশন তুলতে! যাও, বাড়ি যাও। আমাকে দাও। এবার থেকে যদ্দিন বাঁচব, এ কাজটা আমার।"

ভেতরের দালানে পলাশ উদাস হয়ে চুপচাপ বসে ছিল। শোভনা বললেন, "লেখাপড়াটা তা হলে ছেড়েই দিলি।"

পলাশ চুপ করে রইল। কী উত্তর দেবে! পড়তে বসে, মন লাগে না। কী হবে পড়ে! যে-দেশের ছাত্ররা শিক্ষককে মেরে ফেলে, সে-দেশে লেখাপড়ার কী দাম আছে। পলাশ ঠিক করে ফেলেছে, পা'টা যদি ঠিক না হয়, আত্মহত্যা করবে। কী হবে, খোঁড়া হয়ে লেংচে-লেংচে বেঁচে থেকে।

শোভনা বললেন, "তোর বাবা লেখাপড়া ভীষণ ভালবাসতেন। যত টানাটানিই হোক, প্রতি মাসেই বই কিনতেন। কিছু বললেই বলতেন, কম খেয়ে মানুষ বাঁচতে পারে, লেখাপড়া ছাড়া মানুষ মানুষের মতো বাঁচতে পারে না। জন্তু হয়ে যায়। অমন মানুষের ছেলে হয়ে তুই অমানুষ হয়ে যাবি?"

"অমানুষেরই যুগ পড়েছে মা। মানুষ হলে বাবার মতো মরতে হবে।"

"আজকাল তুই মুখে-মুখে ভীষণ তর্ক করিস। যেমন আমার বরাত। এক ফুঁয়ে সংসারের আলো নিবে গেল, আর একটি মাত্র ছেলে, সে হয়ে গেল গোঁয়ারগোবিন্দ।"

পলাশ কিছু বলতে যাচ্ছিল, বলা হল না। দরজার কড়া বেজে উঠল। মধ্যবয়সী বাড়িওলা, রাগ-রাগ গম্ভীর মুখে এলেন। আজকাল প্রায়ই আসেন। কখনও এবেলা-ওবেলা, দু'বেলা। লোকটা মোটেই সুবিধের নয়।

শোভনা ভদ্রতার খাতিরে বললেন, "আসুন।"

ভদ্রলোক ভদ্রতার ধারেকাছে না গিয়ে বললেন, "কী হল, কিছু ভাবলেন?"

"কী ভাবব?"

"এই বাড়িটা আপনাদের ছাড়তে হবে। শম্ভুবাবুকে আমি বলেছিলুম। পুরনো ভাড়ায় আর চলে না। ভাড়া অন্তত ডবল করতে হবে। তাতেও অবশ্য পোষায় না। বিবেচক মানুষ ছিলেন তো! স্বীকার করেছিলেন, এ-বাজারে এত কম ভাড়ায় থাকা চলে না।"

"বাড়ি ছেড়ে আমরা যাব কোথায়?"

"ছোটখাটো এক কামরার একটা ঘর দেখে নিন। এত বড় বাড়ি শুধু-শুধু আটকে রাখবেন কেন?"

"কোথায় পাব এক কামরার ঘর। উঠে যাও বললেই তো আর ওঠা যায় না।"

"শুনুন আমি আপনাকে হাজার-পাঁচেক টাকা ক্যাশ দোব। বলেন তো কাছাকাছি বস্তিতে একটা ব্যবস্থাও করে দিতে পারি। সে-ক্ষমতা আমার আছে। শুনুন, এ-বাজারে ভদ্রলোকের মতো বাঁচার অনেক খরচ। সে আপনারা পোষাতে পারবেন না। ছেলে এখনও রোজগেরে হয়নি। হবার আশাও খুব কম। সুস্থ লোকই কিছু করতে পারছে না, ও তো ...। মান-সম্মান ধুয়ে খাবেন? তার চেয়ে ওই পটুয়াটোলার মাঠকোঠায় চলে যান। ভালই থাকবেন। কম ভাড়া। সেলাইটেলাই করে চলে যাবে যাহোক।"

লজ্জায়, অপমানে শোভনার মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠল। লোকটা বলে কী! শেষে বেশ কাটা-কাটা ভাষায় বললেন,

"এ-বাড়ি আপাতত আমরা ছাড়ছি না, আর বস্তিতে যাব, কী সেলাই করব, ওটা আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। উপদেশের প্রয়োজন নেই।"

বাড়িওলার নাম ভানুবাবু। ভানুবাবু বললেন, "আমি আপনাকে দশ হাজার পর্যন্ত দিতে পারি। দেখুন কী করবেন? তা না হলে আমাকে অন্য রাস্তা ধরতে হবে।"

"সেটা কী?"

"ওই আমার সব ছেলেপুলেরা আছে, তারাই ব্যবস্থা করবে। সে-ব্যবস্থাটা অবশ্য খুব অসম্মানজনক হবে।"

"তাই হোক। তবে জেনে রাখবেন, এটা মগের মুল্লুক নয়। দেশে আইনকানুন আছে। অন্য লোকও আছে।"

"কে ওই অক্ষয়-স্যাকরা আর বুড়ো বিমান-সেতারি! ওদের যুগ শেষ হয়ে গেছে। যাক, আপনাকে আর তিন দিন সময় দিয়ে গেলুম। প্রস্তাবটা আর একবার ভেবে দেখুন ভাল করে।"

"আমার বেশ ভাল করেই ভাবা হয়ে গেছে।"

"মনে রাখবেন দশ হাজার।"

"দশ হাজার কেন, দশ লক্ষতেও ওই এক সিদ্ধান্ত।"

"ভালই হল। আমার অনেক কমে হয়ে যাবে। আমার একটা মানবিক দিক আছে। সেই দিক থেকেই দশ বলেছিলুম। এরপর কারও আর বলার থাকবে না, ভানু দাস অমানুষ।"

ভানু দাস হনহন করে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় চারপাশে তাকাতে তাকাতে গেল। বেরোবার সময় বলে গেল, "বাড়িটার কী অবস্থা হয়েছে! আরে ছি ছি!"

পলাশের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "কী ছোটলোক রে!"

শোভনা বললেন, "হ্যাঁ, বাবা, খুব ছোটলোক না হলে বড়লোক হওয়া যায় না।"

পলাশের সর্বাঙ্গ রাগে রিরি করছে। লোকটা বলে কি পটুয়াটোলার বস্তিতে উঠে যাও। সেলাইটেলাই করো। ভদ্রলোকের মতো বাঁচতে গেলে অনেক টাকার দরকার।

"মা, আজ থেকে আমি আবার পড়ব। চব্বিশ ঘণ্টা পড়ব। তুমি দশটা বছর কষ্ট করো। আমি আই· এ· এস· দিয়ে বড় অফিসার হব। দশটা বছর...."

শোভনার চোখে জল, এক চোখে অপমানের, আর-এক চোখে আনন্দের। বাঘের বাচ্চা বাঘই হয়।

শোভনা বাইরের সদরে গিয়ে দাঁড়ালেন। সামনেই অক্ষয়বাবুর দোকান। বিশাল বড় একটা প্রদীপে মোমের শিখা কাঁপছে। পাইপে ফুঁ মেরে সোনা গলিয়ে, তার সঙ্গে খাদ মেশাচ্ছেন। মেঝেতে পড়ে আছে সাদা সাদা সোহাগার টুকরো। যখন কাজ করেন, সেই সময় লোকটিকে মনে হয় সাধক। সবাই জানে, অক্ষয় অতি খারাপ লোক। শোভনা জানেন, এমন ভাল লোক এ-পাড়ায় আর দুটি নেই।

আজ কাজে এত তন্ময়, একবারও চোখ তুলে শোভনার দিকে তাকাবার অবসর নেই। শোভনা নিজেদের দরজায় খটখট করে বারকতক শব্দ করলেন। অক্ষয় মুখ তুলে তাকালেন। ঠোঁটে ব্লোপাইপ। শোভনা হাত নেড়ে ডাকলেন। অক্ষয়জেঠু বেশ লম্বা মানুষ। ধবধবে সাদা একমাথা চুল। বেশ দেবতা-দেবতা, নারদ-নারদ দেখতে।

অক্ষয় দোকান থেকে নেমে এলেন।

"কী হয়েছে মা!"

শোভনা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন। বড় লেগেছে মনে। অক্ষয় বুঝতে পারছেন না, এই অবস্থায় কী করা উচিত।

"আচ্ছা, তুমি ভেতরে যাও, আমি দোকান বন্ধ করে আসছি।"

পনেরো মিনিটের মধ্যে অক্ষয় দোকান বন্ধ করে ফিরে এলেন। সব শুনলেন। শুনে বললেন, "তুমি বাড়ি ছাড়বে না। আমি আছি। এরপর এসে আবার ছোট-বড় কথা বললে, আমাকে ডেকে পাঠাবে। এ-পাড়ায় ওর ঢোকা আমি বন্ধ করে দোব। এ-বুড়ো এখনও ক্ষমতা রাখে। বয়েসটা আর-একটু কম থাকলে, আজই আমি ধরে এনে তোমার সামনে জুতোপেটা করতুম। মুরগির মতো পালক ছাড়াতুম। অসভ্য, পাজি। কার সঙ্গে কথা বলছে জানে না।"

অক্ষয় উত্তেজনায় দালানে পায়চারি করছেন। এই বয়সেও চাবুকের মতো হিলহিল করছে শরীর। বারকতক এপাশ-ওপাশ করে বললেন, "এ এমন যুগ, মানুষ পয়সা ছাড়া আর কিছুই জানে না। পয়সা, কেবল পয়সা। শিক্ষা, সমাজ, সভ্যতা, ভদ্রতা, সব ভেসে গেল।"

বাইরের দরজার কড়া আবার নড়ে উঠল। দরজা খুলতেই পরপর সাতটি ছেলে এসে ঢুকল। শোভনা ভাবলেন ভানুর দলবল। নিজেকে সেইভাবে প্রস্তুত করলেন। অক্ষয়জেঠুও তৈরি। ঝাঁকড়াচুলো এইরকম দশ-বারোটা ছেলের পাল্লা তিনি এখনও নিতে পারেন। এদের মন নেই, শরীর নেই, সাহস নেই।

অক্ষয়জেঠু কড়া গলায় বললেন, "কী চাও? কী চাও তোমরা?"

নেতা ধরনের একটি ছেলে বললে, "আমরা ক্ষমা চাইতে এসেছি।"

অক্ষয়জেঠু কড়া গলায় বললেন, "তোমরা ক্ষমা চাইলে হবে না, তোমরা যার ভাড়াটে গুণ্ডা সেই ভানুকে আসতে হবে, এসে পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে হবে।"

ছেলেটি অবাক হয়ে বললে, "আমরা তো কারও ভাড়াটে গুণ্ডা নই।"

"তবে তোমরা কে?"

"আমরা মাস্টারমশাইয়ের ছাত্র। আমরাই ঘেরাও করেছিলুম।"

পলাশের শরীরে একটা বিদ্যুৎ-তরঙ্গ খেলে গেল। এরাই তা হলে সেই সাত খুনি।

শোভনা বললেন, "তোমাদের তো বাবা ঠিক মানুষের মতোই দেখতে। সেই দুটো হাত, দুটো পা, একটা মাথা, মানুষের ভাষা। কোনও তফাতই তো নেই। তা হলে?"

ছেলেরা অবাক! কথার মানে বুঝতে পারছে না।

অক্ষয়জেঠু বললেন, "তা হলে অমন সুন্দর মানুষকে মারলে কেন?"

"আমরা তো মারিনি। ঘেরাও করেছিলুম।"

"কেন করেছিলে?"

"ও আমাদের করতে হয়। আমাদের পার্টি আছে না, সেই পার্টি আমাদের দিয়ে করায়।"

"তোমরা ছাত্র?"

"আজ্ঞে, তাই তো বলে।"

"লেখাপড়ার সঙ্গে সম্পর্ক আছে?"

"খুব একটা সময় পাই না। তবে মাঝেমধ্যে বইটই দেখি।"

"পাশ করো কী করে?"

"আন্দোলন করে। দেশে এখন ছাত্র-বিপ্লবের যুগ চলেছে। ঘেরাও করে, কাঁচ ভেঙে, চেয়ার-টেবিল ভেঙে, বাস-ট্রাম পুড়িয়ে দেশে আমরা নয়াজমানা আনতে চলেছি।"

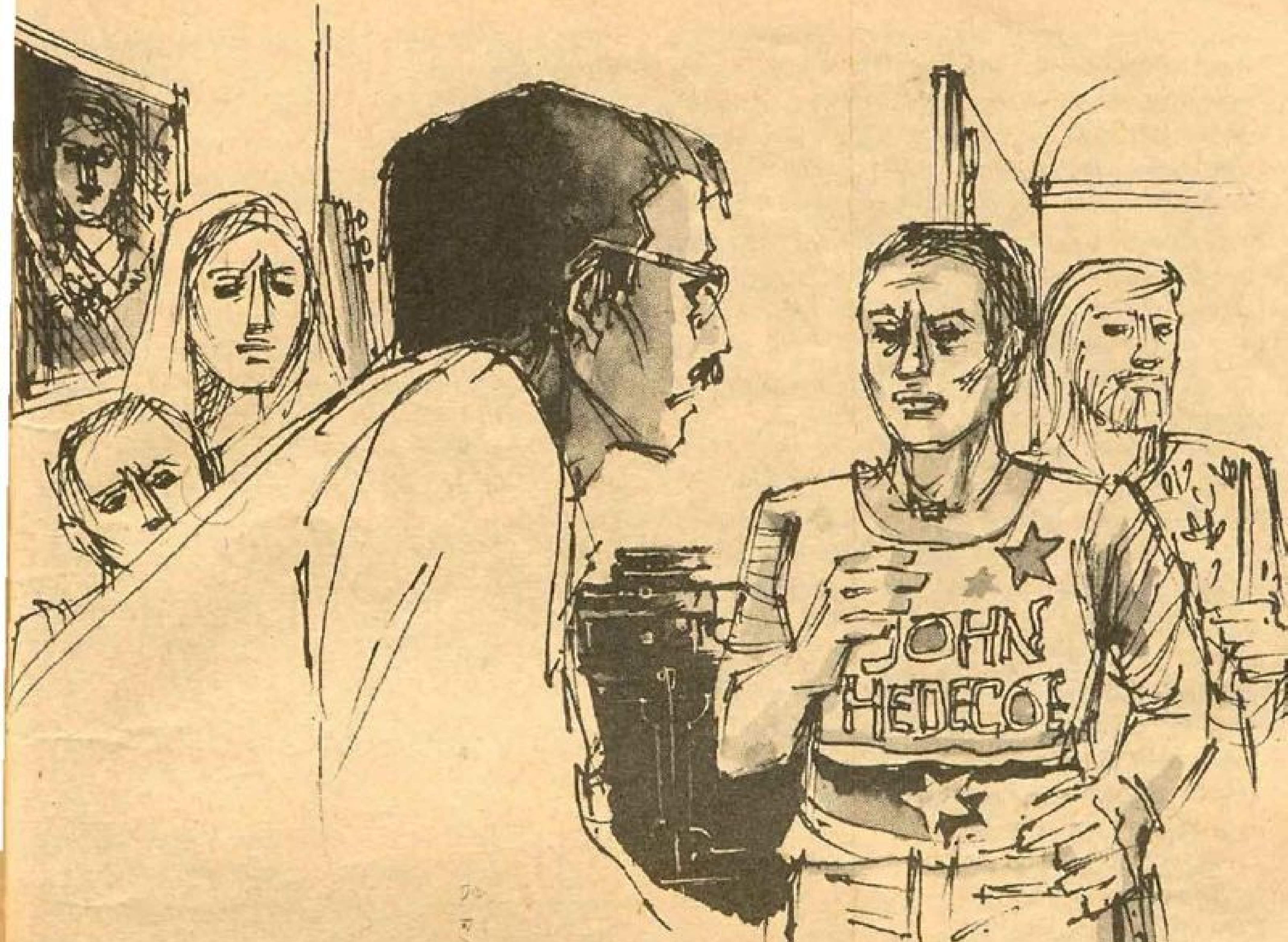

"এইভাবেই সব ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, পণ্ডিত হবে ?"

"আমরা ওসব হব না। আমরা নেতা হব।"

"সবাই যদি নেতা হও, দেশে অত গদি পাবে কোথায় ! তা কী করতে এসেছ এখানে ? আন্দোলন ?"

সাতটা ছেলে চারপাশে তাকিয়ে বললে, "এখানে আর কী আন্দোলন হবে ! আমাদের খুব দুঃখ হয়েছে। স্যার পার্টির লোক ছিলেন না, কিন্তু ভীষণ ভালমানুষ ছিলেন। আমাদের খুব ভালবাসতেন।"

পাশ থেকে আর একটি ছেলে বললে, "একটাই কেবল দোষ ছিল, কেবল বলতেন, পড়ো, পড়ো।"

নেতা ছেলেটি এক ধমক লাগাল, "তুই চুপ কর। এটা থিওরি আলোচনার জায়গা নয়। আমরা এসেছি সমবেদনা জানাতে, সাহায্য করতে।"

"তোমরা এসবও করো !"

"আমরা সব করি। মড়া পোড়াই। বারোয়ারি পুজো করি। পিকনিক করি বছরে দু'বার, বড় দিনে আর নববর্ষে। সাতদিন ধরে ষষ্ঠীতলায় গাজনের মেলা বসাই। আমরা কত কী করি সার। মেয়ের বিয়ের চাঁদা তুলি, শ্রাদ্ধের চাঁদা তুলি। মাঝে-মাঝে বন্‌ধ করি। অ্যাকশান করি।"

"তোমরা ছাত্র ?"

"ছাত্রই তো।"

"মোম ছাড়াই বাতি জ্বলছে। হায় কাল ! হায় মহাকাল !"

"হায়, হায় করে কোনও লাভ নেই সার। আমাদের বাবা-মা সারাদিন হায় হায় করছে। জমানা পাল্টাচ্ছে সার। আমাদের ওই সুদীপ এই বয়সেই পার্টি-মেম্বার হয়ে গেছে। পরের বার করপোরেশান-ইলেকশানে নামছে।"

সুদীপ বললে, "ফালতু বাত ছেড়ে কাজের কথা বল। বেকার সময় নষ্ট করিসনি। নো ফায়দা।"

অক্ষয়জেঠু বললেন, "তুমি বাঙালি !"

"কী মালুম হচ্ছে আপনার ?"

"না, যেরকম হালুম-হালুম করে কথা বলছ।"

"ভাষায় এখন স্পিড এসেছে। জয়ন্ত জিনিসটা দিয়ে দে।"

জয়ন্ত গলাটলা ঝেড়ে বললে, "মাস্টারমশাইয়ের ফ্যামিলির সাহায্যের জন্যে, আমরা কিছু কালেকশান করেছি। হাজার টাকা। সামনের শনিবার হাজারির মাঠে একটা শোকসভা করে টাকাটা আমরা ফ্যামিলির হাতে তুলে দোব। স্থানীয় এম· এল· এ-কে অনেক ধরে সভাপতি হবার জন্যে রাজি করিয়েছি। এরনাকুলাম কনফারেনসে না গেলে তিনি অবশ্যই আসবেন। আমরা প্রেসকেও খবর দিয়েছি।"

শোভনা বললেন, "টাকাটায় তোমরা পিকনিক কোরো, আমাদের সাহায্যের প্রয়োজন নেই।"

"এখনও রেগে আছেন মাসিমা ! সারের শরীর এত দুবলা জানলে আমরা কি ঘেরাও করতুম। সব দোষ ওই কালাটার। টানাটানি করে পাঞ্জাবিটা ছিঁড়ে না দিলে সারের অতটা ইনসাল্ট হত না। ওর মাথায় কিছু নেই। কোনও ক্যালি নেই, আন্দোলনে নেমেছে। গাধ্‌ধে কি গাধে । ব্যাটা কালীপুজোর চাঁদা তোলে তো, গলা আর গামছা ছাড়া কিছু বোঝে না।"

কালার সামনের দাত দুটো বড়। বড়-বড় দাঁত বের করে হাসল খানিক।

অক্ষয়জেঠু জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের দলে কে কিসে এক্সপার্ট ?"

"আমরা সবাই এক-এক লাইনে এক্সপার্ট। এ হল ওপেনার।

মানে, দরকার হলে ব্লেড চালিয়ে যে কোনও গলা এক সেকেণ্ডে ওপেন করে দিতে পারে। ওকে আমরা ইটালি পাঠাব, ফারদার স্টাডির জন্যে। আর এ হল, চমকা। না মেরে যে-কোনও পার্টিকে চমকে দিতে পারে। আর ও হল, স্পিকার। সারাদিন মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে চেল্লাতে পারে। টেরিফিক গলা। বলে কী সুন্দর। ওর মতো কেউ বলতে পারে না। আর ওর পাশে আমাদের লাইনার। যে-কোনও ব্যাপারে ওর মতো কেউ লাইন করতে পারবে না। থানায় যে ও· সি-ই আসুক, ঠিক লাইন করে নেবে। ওর সে ক্যালি আছে।"

অক্ষয়জেঠু বললেন, "বাঃ, সব একেবারে গুণের গুণমণি। তা তোমরা এবার এসো বাবা। তোমরাই তো দেশের ভবিষ্যৎ।"

"আপনারা তা হলে শোকসভায় আসছেন না।"

"না বাবা!"

"তা হলে ওটাকে আমরা সংবর্ধনা-সভা করে ফেলি। তনিমা দাস সাঁতার কেটে এল সাউথ থেকে। ওকে একটা সংবর্ধনা জানানো, আমাদের ন্যাশানাল কর্তব্য। কী বলেন! অবশ্যকর্তব্য!"

"অবশ্য, অবশ্য।"

যাবার সময় বগলা বললে, "মাসিমা, ছেলেটাকে একেবারে নাদান করে রাখলেন!" তারপর পলাশকে বললে, "কী রে, তোর একটা পা নাকি খোঁড়া হয়ে গেছে। লেংড়ে-লেংড়ে হাঁটিস। আমাদের ক্লাবে আসিস, নানটু ফিজিও লড়িয়ে চালু করে দেবে।"

যেমন এসেছিল, আবার সব সেইভাবেই লাইন দিয়ে বেরিয়ে গেল। পলাশের মনে খুব লেগেছে। তাকে ওরা ল্যাংড়া বলে গেল। এর শোধ একদিন নিতে হবে। নিতেই হবে। ওই কালাই তার বাবার গায়ে হাত তুলতে গিয়েছিল। ওই কালাই তার বাবার পাঞ্জাবি ছিঁড়েছে। কালা তোমাকে আমি চিনে রাখলুম।

অক্ষয়জেঠু বললেন, "আমরা আর ক'বছর আছি। যাবার সময় তো হয়েই গেছে। ছেলেদের কী হবে! ভবিষ্যৎ তো খুব ভাল বুঝছি না। এই যারা এসেছিল, এরাই আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ! উঃ, কী ভয়ঙ্কর রে বাবা। বউমা, আমি তা হলে এখন আসি। বিয়ের সিজন যাচ্ছে, খুব কাজের চাপ। চারপাশ থেকে তোমাদের এখন বিপদ আসবে। ঘাবড়ে যেও না। আমি আছি।"

অক্ষয়জেঠু চলে যেতেই, পলাশ বললে, "মা, তুমি আমাকে একটা ক্রাচ কিনে দেবে মা। আমি এখন থেকে অভ্যাস করব।"

শোভনা উত্তর দেবেন কী, ছেলের কথায় চোখে জল এসে গেল। গলা বুজে আসছে। অমন সুন্দর একটা ছেলে, এমন সুন্দর একটা সংসার, ঘন্টাখানেকের মধ্যে শেষ হয়ে গেল। এই নাকি বিধির বিধান! এই বিধাতাকে মানতে হবে। ভক্তি করতে হবে। দু'বেলা প্রণাম করতে হবে।

পলাশ বললে, "ক্রাচের অনেক দাম নাকি মা! একটা কিনতে পাওয়া যায় না। তুমি আমায় একটা কিনে দিও। বাঁ পা'টা তো ঠিকই আছে, ডান বগলে একটা রাখলেই হবে।"

শোভনা পলাশের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন। দু'গাল বেয়ে জল পড়ছে।

পলাশ বললে, "মা তুমি কাঁদছ। কাঁদছ কেন। ওরা আমাকে ল্যাংড়া বলে গেল তো, তুমি দেখবে ল্যাংড়াকে কেউ আটকাতে পারবে না, এগিয়ে যাবে। যাবেই যাবে। আমার বাবা বলতেন, কখনও ভেঙে পড়বি না। মনটাকে সুপুরির মতো শক্ত করবি। মা, যে লরিটা আমাকে চাপা দিয়েছিল, সেই লরির ড্রাইভার কী করছে মা! তার ছেলে নেই, আমার মতো!"

শোভনা এবারেও কোনও উত্তর দিতে পারলেন না। খুব কষ্ট হচ্ছে বুকের কাছটায়। বারকতক ঢোঁক গিলে বললেন, "চল, যা হয় দুটি খেয়ে নিবি চল।"

আগে রোজ মাছ হত। এখন পয়সার আর সে জোর নেই। শম্ভুনাথ ভালই রোজগার করতেন। সঞ্চয় ভেঙে-ভেঙে যদ্দিন চলে। রোজগার করার মতো আর কেউ নেই। তা ছাড়া পলাশ বলেছে, "মাছ, মাংস, ডিম, পেঁয়াজ এ বাড়িতে ঢুকবে না। তুমি খাবে না যখন, আমিও খাব না।"

একটু বেলা করেই খাওয়া হয়। বিকেলের জলখাবার আর লাগে না। সেই রাতে খান কয়েকখানা রুটি। "এই ভাবে শরীর থাকবে?"

"তুমি কিচ্ছু ভেবো না মা। মনে পড়ে বাবা বলতেন, খাবার জন্যে বেঁচো না, বাঁচার জন্যে খাওয়া। তুমি আমার সঙ্গে ওই কবিরাজ-পাড়ার ফুটপাথে চলো, দেখবে মানুষ কীভাবে, কী খেয়ে বেঁচে আছে।"

৫

শ্যামলীরা কুলু-মানালি থেকে ফিরে এসেছে। ওরা কিছুই জানত না। একটা ভাল সোয়েটার, আপেল, চেরিফল, মেয়েদের একটা শাল, এক-শিশি গোলাপ-আতর নিয়ে শ্যামলী দুপুরে পলাশদের বাড়িতে এল। শ্যামলী ভীষণ ফর্সা, ঘুরে আসার পর গাল দুটো লালচে হয়ে উঠেছে।

শ্যামলী যখন এল, পলাশ তখন লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটা অভ্যাস করছে। সারা বাড়ি নিস্তব্ধ। শোভনা জানলার ধারে বসে ভাবতে-ভাবতে, দেয়ালে পিঠ রেখে ঘুমিয়ে পড়েছেন। এখন আর বেশি ভাবতে পারেন না। ভেবে তো কিছু হবে না। যা হবার তা হবে।

শ্যামলী বুঝতে পারছে না কী হয়েছে! তার মুখের হাসি মুখেই মিলিয়ে গেছে। ভয়ে ভয়ে পলাশকে জিজ্ঞেস করলে, "কী হয়েছে রে! তোর মাথা ন্যাড়া?"

পলাশ লাঠিটাকে ঘরের কোণে রাখতে রাখতে বললে, "বাবা, মারা গেছেন।"

শ্যামলীর হাত থেকে একে-একে সব পড়ে গেল। ঘরময় আপেল গড়াচ্ছে, চেরিফল ছড়িয়ে গেছে টুকটুকে রুবির দানার মতো। সোয়েটার আর শালের প্যাকেট পড়ে আছে আর একপাশে। শ্যামলী ধীরে ধীরে মেঝেতে বসে পড়ল। তার জ্যাঠামশাই নেই, এ যেন সে ভাবতেই পারছে না।

অনেক পরে চোখ মুছে বললে, "কী করে মারা গেলেন?"

পলাশের এমনিই খুব অভিমান হয়েছিল শ্যামলীর ওপর। বড়লোকের মেয়ে। বছরে দু'তিনবার প্লেনে চেপে বেড়াতে ছুটছে। লাল হয়ে ফিরে আসছে। দুঃখ-কষ্টের কথা বড়লোকের আদুরি মেয়েকে শুনিয়ে লাভ কী! পলাশ বললে, "সে শুনে তোর লাভ কী! বাবা মারা গেছেন, তিনি আর নেই। তিনি আর নেই।"

বলতে বলতে পলাশ কেঁদে ফেলল। চারপাশে আপেল আর চেরি গড়াচ্ছে। বসে আছে শ্যামলী জলভরা অবাক চোখে।

সামনে দাঁড়িয়ে আছে পলাশ। রোগা হয়ে গেছে। কালো হয়ে গেছে। ডান পা'টা কীরকম সরু হয়ে গেছে। পলাশের উত্তরে প্রথমে সে ভেবেছিল রেগে যাবে। পলাশের এই অবস্থা দেখে তার রাগ কোথায় উড়ে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে এসে পলাশের হাত ধরল। অনেক কিছু বলতে চায়। গলা দিয়ে কথা সরছে না।

পলাশ ধরা-ধরা গলায় বললে, "আমাদের সব গেছে। আমরা শেষ হয়ে গেছি।"

শ্যামলী বড়-বড় চোখে পলাশের দিকে তাকাল। তার মনের সেই পুরনো জোর ফিরে আসছে। সেই শ্যামলী। শ্যামলী জোর গলায় বললে, "তোদের সব আছে। কিছুই শেষ হয়নি। অত সহজে শেষ হয় না কিছু। সব মানুষই একদিন মরবে। আজ হোক, কাল হোক। তুই বোস। এই চেয়ারটায় তুই বোস।"

পলাশকে চেয়ারে বসিয়ে শ্যামলী দু'হাতে আপেল আর চেরি কুড়োতে লাগল। হামাগুড়ি দিয়ে, কখনও প্রায় শুয়ে পড়ে শ্যামলী ছড়ানো ফল এক জায়গায় জড়ো করছে, নীল রঙের ফুল-ফুল ফ্রক। মাথায় এখনই এত চুল, খোঁপাটা বেশ বড় দেখাচ্ছে। পলাশের অভিমান কমতে শুরু করেছে। শ্যামলীর কী দোষ! শ্যামলীর বাবা যে ভীষণ বেড়াতে ভালবাসেন। শ্যামলীর মা'ও যে ভীষণ আধুনিকা। খুব বড়লোকের মেয়ে।

পলাশ গড়গড় করে বলে গেল, "জানিস, আমরা কত গরিব হয়ে গেলুম! জানিস বাবার সব টাকা ওরা আটকে রেখেছে! জানিস, আমাকে স্কুল ছাড়তে হবে! জানিস, আমাদের বাড়িওলা বলেছে, যেভাবেই হোক আমাদের উঠিয়ে ছাড়বে! জানিস, আমার ডান পা'টা কীরকম শুকিয়ে যাচ্ছে! তোর আর কী! তুই তো বলবি, কিছুই শেষ হয়নি। সব ঠিক আছে।"

"শোন, আমি সব বুঝতে পারছি। জানি, এ-সংসারের বিশাল একটা গাছ ভেঙে পড়েছে, কিন্তু, তুই তো আছিস! তুই হেরে যাবি কেন?"

"তোদের ওই এক কথা, হেরে যাবি কেন, হেরে যাবি কেন! জিততে গেলে শক্তি চাই। আর শক্তি হল পয়সা। সেই পয়সাটাই আমাদের নেই। আজ গেলে কাল কী হবে আমরা জানি না।"

"ভগবান আছেন।"

"ভগবান! ভগবান হলেন বড়লোকের। জানিস, আমার বাবাকে খুন করেছে!"

"খুন!"

"হ্যাঁ, খুন। খুনই বলা চলে। রাজনৈতিক খুন। যে-খুনে খুনির কোনও বিচার হবে না, সাজাও হবে না। তবে আমি তোকে বলে রাখছি, বগলাকে আমি দেখে নেব।"

"কে বগলা?"

"তুই জানিস আমার বাবা কীভাবে মারা গেছেন?"

"কিচ্ছু জানি না রে! আমরা কাল রাতে ফিরেছি।"

"আমরা খুব শিগগির একটা বস্তিতে হয়তো উঠে যাব। তুই আর আসিস না শ্যামলী। আমি যদি কোনওদিন বড় হতে পারি, বড়লোক হতে পারি, তখন আমি তোর সঙ্গে নিজে গিয়ে দেখা করব। এখন আর আসিস না।"

"তোর মাথায় হঠাৎ বড়লোক ঢুকল কেন রে! বড় হওয়া আর বড়লোক হওয়া এক হল?"

"আমি খোঁড়া।"

"তুই খোঁড়া বলে আমি আসব না! ভারী অদ্ভুত কথা

তো?"

"জানিস, এখন থেকে সবাই আমাকে ল্যাংড়া বলতে শুরু করেছে।"

"বলুক, তাতে তোরই বা কী, আর আমারই বা কী! শোন পলাশ, ও সব বাজে ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাস না। নে, একটা আপেল খা।"

শ্যামলী কচ করে একটা আপেলের খানিকটা কামড়ে নিয়ে বাকিটা পলাশের ঠোঁটে চেপে ধরল। পলাশ প্রথমে খেতে চাইছিল না, মুখ সরিয়ে নেবার চেষ্টা করছিল, শ্যামলী চেপে ধরে মুখে গুঁজে দিল।

পলাশ বললে, "তোর একটুও দুঃখ হচ্ছে না?"

"হবে। রাতে যখন একা হয়ে যাব, তখন মনে পড়বে রে। জানিস তো আমার ভাইটার জন্যে এখনও আমি ভাল করে ঘুমোতে পারি না। কীভাবে মারা গেল বল পলাশ। কী সুন্দর দেখতে ছিল! তবে জানিস তো, আস্তে-আস্তে সব সহ্য হয়ে যায়। আজ যত মনখারাপ হচ্ছে, এক বছর পরে অতটা হবে না, কুড়ি বছর পরে কষ্ট করে মনে করতে হবে। শোন, আমি আজকে বাবার সঙ্গে কথা বলে তোকে আমেরিকা পাঠাবার ব্যবস্থা করব।"

"আমেরিকা! আমেরিকায় পাঠাবি কেন?"

"ওখানে গেলে তোর পা ভাল করে দেবে ওরা। অনেক বড়-বড় ডাক্তার আছে সেখানে।"

"তুই আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করছিস শ্যামলী? কাল আমরা কী খাব তার ঠিক নেই, আর আমি পা মেরামত করাতে বিলেত যাব!"

"ইয়ার্কি নয় পলাশ। আমার বাবার সঙ্গে অনেকের আলাপ আছে, একটু ধরাকরা করলেই হয়ে যাবে।"

"আর আমার মায়ের কী হবে?"

"জ্যাঠাইমা আমাদের কাছে থাকবেন।"

"রাঁধুনি হয়ে।"

শ্যামলী অনেকক্ষণ কোনও কথা বলতে পারল না। তার চোখে জল এসে গেছে। শেষে অনেক কষ্টে বললে, "পলাশ, কেউ মারা গেলে কারও মন যে এত ছোট হয়ে যায় আমার জানা ছিল না। ঠিক আছে, তুই যখন চাস না, আমি আর আসব না। আবার যখন চাইবি তখন আসব।"

আচমকা বলে ফেলে পলাশও কেমন যেন হয়ে গেছে। শ্যামলী চলে যাচ্ছে দেখে, সে তাড়াতাড়ি উঠে তাকে ধরার চেষ্টা করল। পারল না। ডান পা'টা একেবারে অকেজো হয়ে গেছে। হাঁটুর তলা থেকে পাজামার পায়ের মতো লতপত করছে। কোনও জোর নেই। কোনওরকমে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে দরজার কাছ পর্যন্ত যখন গেল, তখন শ্যামলী চলে গেছে।

টেবিলের ওপর টুসটুসে চেরি আর লাল আপেল। খাটের ওপর সোয়েটার আর চাদর। শ্যামলীর দাঁত-বসানো আধখানা আপেল। পলাশ দেয়ালে ঝোলানো শম্ভুনাথের ছবির দিকে তাকিয়ে কেঁদে ফেলল, "কী অসহায় আমি। আমি ভাল করে আর কোনওদিন চলতে পারব না, ভাল চাকরি পাব না, আমার মায়ের জন্যে আমি কিছুই করতে পারব না। শ্যামলী আজ এসেছিল, একদিন সেও আর আসবে না। ওর নতুন-নতুন বন্ধু হবে। কত দেশ ঘুরে ঘুরে দেখবে!" পলাশ আধখাওয়া আপেলটা ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিল।

৬

রাত দুটো। রাত সাড়ে দশটার সময় সেই যে আলো চলে গেছে আর আসেনি। আলকাতরার মতো অন্ধকারে সখের বাজার এলাকার ঘিচিঘিচি ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, নর্দমা, সব ডুবে আছে। একটু আগে হরির তেলেভাজার দোকানের কাছে একটা কুকুর খুব কাঁদছিল। সেই কান্না শুনে পলাশের গা-ছমছম করছিল। আলো চলে যাবার সঙ্গে-সঙ্গেই শুয়ে পড়েছে। কী করবে! কেরোসিন কেনার কথা এখন দু'বার ভাবতে হয়। শুয়ে আছে তো আছেই, ঘুম আসার নাম নেই। দুটো ছবি থেকে থেকে আসছে। প্রথম সেদিনের সেই দুর্ঘটনা। রাস্তার একপাশ দিয়ে বাবা আর সে গল্প করতে-করতে আসছে। সেদিন বাজারে অনেক রকম মাছ এসেছিল। এত মাছ সাধারণত আসে না। বাবা মাছ ভালবাসতেন। প্রাণ খুলে মাছ কেনা হয়েছিল সেদিন। ফেরার পথে বাবা মাছের গল্প বলছিলেন। কত রকমের মাছ আছে! কোন জলে কী মাছ হয়। সমুদ্রের মাছ, নদীর মাছ, ভেড়ির মাছ, পুকুরের মাছ, ধানখেতের চিংড়ি। মাছ কী ভাবে চিনতে হয়! অলকানন্দা স্টোরসের সামনে সবে এসেছে, পেছনে ভীষণ হইচই, বিকট একটা শব্দ, যেন দৈত্য তেড়ে আসছে, সব ছাপিয়ে বাবার গলা, সরে আয়, সরে আয়। নিমেষে সব অন্ধকার। একবার মাত্র মনে হল, সারা শরীরটা কে যেন গামছার মতো নিংড়ে দিলে।

দ্বিতীয় ছবি, সেদিন রাতে বাবার ফিরে আসা। কী ভীষণ উৎকণ্ঠা! সাতটা বাজে, আটটা বাজে, নটা বাজে, বাবা আর আসেন না। মাছের কচুরি হবে। মা সব ঠিকঠাক করে, পুর দিয়ে লেচি কেটে রেখেছেন। বাবা এলে গরম গরম ভেজে দেবেন। দশটা বাজল। সাড়ে দশ হয়ে গেল। বাবার ছাত্রী, কলেজে পড়ে রত্না, বসে থেকে থেকে অপেক্ষা করে করে, এক সময় চলে গেল। শেষে, সেই পুলিশের ভ্যানটা এল। হেড লাইটের আলো অন্ধকার চিরে এগিয়ে আসছে। বাবা নামলেন। যখন নামলেন তখনও বেশ তেজী মানুষ। মাথার চুল এলোমেলো। মুখটা অসম্ভব লাল। চশমার পেছনে চোখ দুটো যেন জ্বলছে। পাঞ্জাবিটা ছিঁড়েখুঁড়ে কেমন যেন হয়ে গেছে। সেই পুলিশ-অফিসার পায়ের ধুলো নিচ্ছেন। বাবা বলছেন, বউমাকে নিয়ে এসো একদিন। ব্যস, তারপর সব ভেঙে পড়ার দৃশ্য। উল্টেপাল্টে, টাল খেয়ে সব যেন ধসে পড়ছে।

রাত দুটো হল। পলাশের চোখে ঘুম নেই। বাইরে অন্ধকার পথ। হরির দোকানের কাছে কুকুর কাঁদছে। কাল সকালে আবার লোক-চলাচল শুরু হবে। পলাশ জানতেও পারল না, বাইরে কী হচ্ছে। সেই বড় রাস্তার মোড়ে একটু আগে কালো-কুচকুচে একটা অ্যামবাসাডার এসে, একেবারে অন্ধকার ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। সব আলো নেবানো। পাঁচটা ছেলে নেমে এল। যে ড্রাইভার সে কেবল রয়ে গেল। পাঁচটা ছেলের মুখেই কালো রঙের পাতলা রবারের মুখোশ। চেনার উপায় নেই, এরা কারা।

ছেলে পাঁচটা পলাশদের রাস্তায় ঢুকে পড়ল। হারুর দোকানের সামনে কুকুরটা কান্না ভুলে চিৎকার জুড়ছিল, একজন চট করে কী একটা ফেলে দিল কুকুরটার সামনে। আরও চার-পাঁচটা কুকুর শোরগোল শুরু করার আগেই ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

ছেলে পাঁচটার মুখে কোনও কথা নেই। জুতোর কোনও আওয়াজ নেই। অন্ধকারে পাঁচটা ছায়া। পলাশের মনে হল কোথায় যেন খুট করে একটা শব্দ হল। সারা বাড়ি অন্ধকার। ছাদ থেকে নীচে পর্যন্ত সব অন্ধকার ঘুটঘুটে। পেছন দিকে ম্যাও করে একটা বেড়াল ডেকে উঠল। কই, কোনওদিন তো রাতে এভাবে বেড়াল ডেকে ওঠে না। বেড়াল নেই বললেই চলে। পলাশ কান খাড়া করে রইল। রাতে ঘুম না আসার এই যন্ত্রণা। ভোঁসভোঁস করে ঘুমোতে পারলে, কোথায় শব্দ, কোথায় বেড়ালের ডাক, কুকুর কেন কাঁদছে, খুট করে শব্দ কিসের, এই সব দুর্ভাবনায় টান টান হয়ে থাকতে হয় না। যা হবার ঘুমের মধ্যেই হয়ে যাক। মা কেমন ঘুমোচ্ছেন! মায়ের শরীর একদম ভেঙে গেছে। যে-কোনও জায়গায় বসলেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। শুলে তো কথাই নেই।

আবার সেই বেড়ালটা। ঘুরে ওদিক থেকে এদিকে চলে এসেছে। এত রাত সে জেগে আছে, কই কোনও রাতে তো এভাবে বেড়াল উৎপাত করেনি। ঠিন্ করে তীক্ষ্ণ, ধারালো একটা শব্দ হল কোথাও। বাবা, শব্দ শেখাতে শেখাতে একদিন একটা টিউনিং ফর্ক দিয়ে এইভাবে শব্দ করে বলেছিলেন, 'একে বলে হাইপিচড সাউণ্ড।' এমন শব্দ, এই রাতে কোথা থেকে হল! বাবার সেই ফর্কটা পড়ার ঘরের টেবিলের ড্রয়ারে আছে। কে বাজাচ্ছে! ইঁদুর। ইঁদুর তো কখনও চোখে পড়েনি। তা হলে!

তা হলে এত দিন সে যার জন্যে অপেক্ষা করছিল তাই হল! এমন কী হতে পারে যে, মৃত্যুর পর বাবার আত্মা একদিনও তাঁর এতদিনের বাসস্থানে ফিরে আসবেন না! তাকে মা'কে একবার দেখতে আসবেন না! তাঁর পড়ার ঘর, লেখার খাতা, বই, নোটস, ডায়েরি, কত কী পড়ে আছে! কত কাজ বাকি থেকে গেছে। ওই ঠিন্ শব্দটা তিনিই করেছেন। পড়ার ঘরে গেলেই

দেখা যাবে, অন্ধকারে বসে আছেন। জানালার দিকে মুখ করে, সাদা মূর্তি। টেবিলের ড্রয়ার খুলেছেন। কলম, ছুরি, চশমার খাপ, চাবি।

এইবার চিন্‌ করে একটা শব্দ হল। কাচ ফেটে গেলে যেরকম শব্দ হয়। বেশ সরু আওয়াজ।

পলাশ বিছানায় উঠে বসল। ওপাশের বিছানায় মা, ঘুমে বেহুঁশ। মাকে ডাকা চলবে না। এই সুযোগ সে হারাতে চায় না। আজ সে সাহস করে বাবার সঙ্গে দেখা করবে। জিজ্ঞেস করবে, আপনি কেমন আছেন, কোথায় আছেন। আর আজ সে একটা জিনিস চাইবে। এখন চাইলেই পারে। মানুষ যা পারে না, আত্মা তা পারে। তার ডান পা'টা ইচ্ছে করলেই ভাল করে দিতে পারেন।

মশারি তুলে পলাশ কোনওরকম শব্দ না করে দেড় পায়ে মেঝেতে নেমে দাঁড়াল। বহুক্ষণ অন্ধকারে আছে। চোখ সয়ে গেছে। সব কিছুই মোটামুটি দেখতে পাচ্ছে। মায়ের বিছানার পাশ দিয়ে সাবধানে, খাটের কাঠ, চেয়ারের পেছন ধরে ধরে বেরোবার দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

এগোতে-এগোতে সে আর একটা শব্দ পেল। খুব নরম পায়ে কে যেন উঁচু থেকে লাফিয়ে নীচে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে বেড়ালের ডাক, ম্যাও। বেড়ালটা আজ খুব জ্বালাচ্ছে। পলাশ খুব সাবধানে, কোনওরকম শব্দ না করে ছিটকিনি খুলে দরজাটা সামান্য ফাঁক করল। উঁকি মেরে দেখল। দেখেই নিঃশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিল। শেষ রাতে চাঁদ উঠেছে পশ্চিমে। বাইরের ঘেরা উঠোনে সেই আলো ঝাপসা হয়ে পড়েছে। যেন ফিকে হলুদ কাঁচের মধ্যে দিয়ে সে এক্ষুনি বাইরেটা দেখল। উল্টোদিকে রান্নাঘর, বাথরুম, ভাঁড়ার। ছাদটা একতলা। সেই ছাদে তিনটে ছায়ামূর্তি পাশাপাশি। উঠোনে একটা, আর একটা দড়ি বেয়ে প্রায় নেমে পড়েছে।

থুপ করে একটা শব্দ হল। দড়ি বেয়ে যে নামছিল, সে নেমেই পড়ল। আবার বেড়ালের ডাক। পলাশ প্রথমে ভীষণ ভয় পেয়েছিল। পাঁচ-পাঁচটা অচেনা লোক এই অন্ধকার রাতে একেবারে বাড়ির ভেতরে চলে এসেছে। এক পলকের জন্যে একজনের মুখ চোখে পড়ছিল। কালো মুখোশ আঁটা। এই বারেবারে বেড়াল ডাকায় পলাশের ভীষণ হাসি পাচ্ছে। ডাকটা ঠিকমতো হচ্ছে না। কখনও হয়ে যাচ্ছে হুলোর ডাক, কখনও হয়ে যাচ্ছে মেনির।

পলাশ চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। পাঁচজন আর তারা দুজন। চিৎকার করলে কেউ আসবে না। 'চোর' 'চোর' বলে চেঁচালে, আজকাল কেউ ছুটে আসে না। নিজেদের সামলাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কী করা যায়! যা কিছু আছে তাও নিয়ে যাবে। বাবার ওপর পলাশের ভীষণ অভিমান হচ্ছে। এইভাবে সব ছেড়ে, সব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে যেতে আছে! আমরা যখন বিদেশে বেড়াতে যাই, তখন কি বাড়ির কথা একেবারে ভুলে যাই! অশরীরী মানুষের অসীম শক্তি। বাবা তো দেখতেই পাচ্ছেন, আমরা বিপদে পড়েছি। মায়ের ওই শরীর, আমার পায়ের এই শোচনীয় অবস্থা। ঠিক আছে, যা হবার তা হয়ে যাক। সব যাক, সব যাক। প্রচণ্ড অভিমানে পলাশের চোখে জল এসে গেল। ওরা যদি দরজা ভেঙে এই ঘরে ঢুকে মেরেও ফেলে পলাশ মুখ দিয়ে টুঁ শব্দটি বের করবে না। ভয়টয় কিছুই তার করছে না। ভীষণ রাগ হচ্ছে। রাগ হচ্ছে বাবার ওপর। ভাগ্যের ওপর। বাবা তো এই মুহূর্তে তাঁর অশরীরী শক্তি দিয়ে সব কটাকে শেষ করে দিতে পারেন। রাগ হচ্ছে বিমানদাদুর ওপর। কত দিন আসেননি।

রান্নাঘরের ছাদ থেকে মুখোশ-পরা শেষ ছেলেটি উঠোনে নেমে এল। ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে কী সব বলাবলি করলে। হাত দিয়ে টর্চের মুখ ঢেকে চারপাশে আলো ফেলে দেখে নিল। বাইরের রকে কয়েক-জোড়া জুতো, গোটা-দুই বালতি, এক কোণে জানলার গ্রিল থেকে ঝুলছে শম্ভুনাথের ছাতা। গদি-আঁটা চেয়ার।

ওরা প্রথমেই বাইরে থেকে পলাশদের ঘরের ছিটকিনি তুলে দিল। পলাশ দরজার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। বুঝতে পারল ব্যাপারটা কী হল। বাইরে বেরোবার পথ বন্ধ হয়ে গেল।

এই পাঁচজনের দলের নেতা যে, সে এবার এগিয়ে গেল শম্ভুনাথ যে-ঘরে বসে লেখাপড়া করতেন, ছেলে পড়াতেন, পরীক্ষার খাতা দেখতেন, সেই ঘরের দিকে। শম্ভুনাথ ঘরটা শেষ যেভাবে ব্যবহার করেছিলেন, ঠিক সেই ভাবেই রাখা আছে। বই, খাতা, কলম, পড়ার চশমা। নতুনের মধ্যে দেওয়ালে ঝোলানো হয়েছে বেশ বড় মাপের তাঁর একটি ছবি। রাতের মতো ঘরটি বন্ধ করার আগে পলাশ ধূপ জ্বেলে দিয়েছিল। সারা ঘরে সেই সুবাস থমকে আছে।

দলপতি ঘরে ঢুকে টর্চের আলো ঘোরালো। ফিসফিস করে বলল, "পড়ার ঘর।" তারপর একটানে মুখোশ খুলে ফেলে বললে, "আহা যেন মন্দির।"

টর্চের আলো শম্ভুনাথের ছবিতে স্থির হল। মুখোশ খোলার পর যারা চেনে, তারা অবাক হয়ে বলত, "ভোলা তুই!" অপরেশ-ডাক্তারের কমপাউণ্ডার। দিনের বেলা ছেলেটির অন্য চেহারা। রাতের ভোলা আর দিনের ভোলায় আকাশ-জমিন ফারাক।

ভোলা ছবিটা দেখেই বললে, "এ কী মাস্টারমশাই! ভানু তো একবারও বলেনি, মাস্টারমশাই তার ভাড়াটে! শয়তান!" ভোলা আলো নিবিয়ে দিল। অন্ধকারে তার গম্ভীর গলা শোনা গেল, "এ বাড়িতে কিছু করা যাবে না।"

চেলা বললে, "তার মানে? ভানুদার টাকা খেয়েছি আমরা। সব লণ্ডভণ্ড করে না গেলে সব টাকা উগরে দিতে হবে গুরু। সে-কথা খেয়াল আছে?"

"খুব আছে। সে আমি বুঝব। ভোলাকে টাকার ভয় দেখাস না। এ আমার মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি। এখানে আমি হাত ঠেকাতে দেব না।"

অন্ধকারে হাসি শোনা গেল। আর এক চেলা বললে, "কী আমার মাস্টার রে! অমন মাস্টার না হলে এমন ছাত্র হয়।"

ভোলা অন্ধকারে এগিয়ে গেল। কী করলে বোঝা গেল না। চাপা একটা আর্তনাদ শোনা গেল। ভোলার গম্ভীর গলা, 'মুখ সামলে বগলা। তোকে আমি জানে মারব না, তবে এমন করে দোব সারাজীবন পঙ্গু হয়ে পড়ে থাকবি। মাস্টারমশাইয়ের দোষ নয়, দোষ আমার।"

এ সেই বগলা। যে সেদিন এসে পলাশকে ল্যাংড়া বলেছিল। বগলা অন্ধকারে মেঝেতে দুমড়ে বসে পড়েছে। ভোলা শাস্তি দেবার অনেক কায়দা জানে।

প্রথম চেলা বললে, "আমরা তা হলে চলে যাই।"

"হ্যাঁ যাব। ভোর হয়ে আসছে। যাবার আগে তোদের কাছে, যার যা টাকা আছে, সব এখানে এই টেবিলের ওপর রাখ। আমি শুনেছি, মাস্টারমশাই যাবার পর, সংসার একেবারে অচল হয়ে পড়েছে।"

"একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে না?"

ভোলা চাপা হুঙ্কার ছাড়ল, "চলা, সাবধান, তোর অবস্থাও বগলার মতো হবে।"

ওরা যেভাবে এসেছিল, সেইভাবেই চলে গেল। বগলা সোজা হয়ে হাঁটতে পারছে না। ভোলা এমন কিছুই করেনি, পেটের পেশিটা খপ করে টেনে ধরে একটু মোচড় মেরে ছেড়ে দিয়েছে। যাবার আগে ভোলা পলাশদের ঘরের ছিটকিনি খুলে দিয়ে গেছে। পলাশ সেই শব্দটুকুই পেয়েছে। ভেবেছিল, এ-ঘরে দরজা ভেঙে ঢুকবে। মনে মনে প্রস্তুত হয়েই ছিল। মার খাবার আগে মারবে এমন কথাও ভেবেছিল। বাইরে ফিসফাস হল, চলাফেরার শব্দ হল, কেউ কিন্তু এল না।

হঠাৎ শোভনার ঘুম ভেঙে গেল। তিনি ঘুম চোখেই বললেন, "এ কী, তুমি এখনও শোওনি! কত রাত অব্দি পড়বে! এবার শুয়ে পড়ো।"

পলাশ জানে, মা এ-কথা তাকে বলছেন না। বলছেন বাবাকে। মায়ের এই ভুলটা আজকাল প্রায়ই হচ্ছে। বাবা যে নেই, আর কোনওদিন বাবা যে এ-বাড়িতে ফিরে আসবেন না, মা ভুলে যান। পলাশের মাঝে-মাঝেই মনে হয়, মা বোধহয় পাগল হয়ে যাচ্ছেন।

শোভনা উঠে বসে বললেন, "কী রে, তুই ওখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন! কটা বাজল?"

পলাশ ফিসফিস করে বললে, "সাড়ে তিনটে। আস্তে কথা বলো।"

শোভনা ভয়ে ভয়ে ফিসফিস করে বললেন, "কেন রে, পিওন এসেছে?"

পলাশ শুধু অবাক নয়, মায়ের কথা শুনে ভয় পেয়ে গেল ভীষণ, ডাকাত পড়ার থেকেও বেশি ভয়। মা কি সত্যিই পাগল হয়ে গেলেন। পলাশ বললে, "এত রাতে পিওন কোথা থেকে আসবে মা!"

শোভনা ভীষণ রেগে বললেন, "তুই একটা গাধা, তুই একটা গোরু। জানোয়ার জানিস না, টেলিগ্রাম যে-কোনও সময়ে আসতে পারে। খোল দরজা। দরজা খুলে টেলিগ্রামটা নে। দ্যাখ কে মারা গেল। নন্দবাবুর বয়েস হয়েছে। দাঁতের যন্ত্রণায় ভুগছিলেন।"

কে নন্দবাবু! দাঁতের যন্ত্রণায় কেউ কি মরে? পলাশের মাথায় এল না।

দরজা খুলতে পলাশ ইতস্তত করছে দেখে, শোভনা বলে উঠলেন, "ও, তোর তো আবার নড়তেচড়তেই দশ ঘন্টা।"

শোভনা হেঁকে উঠলেন, "দাঁড়াও খুলছি। আমিই খুলছি।"

পলাশ পা টেনে টেনে মায়ের কাছে এসে, চুপিচুপি বললে, "চেঁচাচ্ছ কেন? বাড়িতে ডাকাত পড়েছে।"

শোভনা বললেন, "পেছলে পা পড়লেই পড়তে হবে। কেউ বাঁচাতে পারবে না। তোর বাবাই হড়কে পড়ে গেল। তুলে দিয়েছিস!"

পলাশ চুপ করে রইল। আর কোনও সন্দেহ নেই, একটু-একটু করে যা হচ্ছিল, আজ শেষ রাতে তা একবারেই হয়ে গেল। মায়ের মাথার কলকব্জা একটু একটু করে ঢিলে হচ্ছিল। কখনও খুব কথা বলছেন। কখনও চুপচাপ। সারা দিন হয়তো শুয়েই আছেন, নয়তো যে-কোনও একটা কাজ নিয়েই সারা দিন পড়ে আছেন অকারণে। পেতলের একটা প্রদীপ মাজছেন তো মাজছেন। মেজেই চলেছেন।

পলাশ চুপ করে আছে। শোভনা চিৎকার করে উঠলেন, "তুলে দিয়ে এসেছিস! খোকা --আ--।"

প্রায় মশারিটশারি ছিঁড়ে মা বেরিয়ে এলেন। ঘরে হাল্কা একটা অন্ধকার। বাইরে ভোর হচ্ছে আর একটা দিন আসছে আলোর রথে চেপে। নিতাইকাকু রোজকার মতো মর্নিং ডিউটিতে চলেছেন। ওঁর পকেটে সব সময় একজোড়া খঞ্জনি থাকে। সারাটা পথ এই নামগান করতে করতেই চলে যাবেন। পলাশ নিতাইকাকুর মতো হবে। দশখানা বাড়ির ওপাশে একজনদের একটা গ্যারাজ ভাড়া নিয়ে থাকেন। একেবারে একা। সবাই বলে খুব বড়লোকের ঘরের ছেলে। কী মজার জীবন! এই ভোরে নাম করতে করতে বেরিয়ে গেলেন, ফিরবেন সেই সাতটা সাড়ে সাতটায়। কারও সঙ্গে একটাও কথা নেই, বাজে গল্প নেই। পলাশকে একদিনই বলেছিলেন, "বড় হওয়ার মতো অসুখ আর কিছু নেই। সাঙ্ঘাতিক ব্যামো। জীবন নিয়ে সে যে কী ভীষণ দড়ি-টানাটানি!"

হাল্কা অন্ধকারে দু'হাত বাড়িয়ে মা এগিয়ে আসছেন পলাশের দিকে। বড় বিশ্রী দেখাচ্ছে মা'কে। চুল খোলা। এলোমেলো। কাপড় অগোছালো। পা দুটো সমান তালে পড়ছে না। একটা এদিকে আর একটা ওদিকে।

বারবার একই কথা চিৎকার করে চলেছেন, "তুলে দিয়েছিস খোকা, তুলে দিয়েছিস?"

ডাকাতের চেয়ে মা'কে এখন বেশি ভয় করছে পলাশের। এক মুহূর্তে চেনা মানুষ কেমন অচেনা হয়ে গেছেন। পলাশ তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা খুলে ফেলল। খোলার আগে ভেবেছিল, খোলামাত্রই হুড়মুড় করে সব এসে ঢুকবে। নেবার মতো যদি কিছু থাকে, তো এই ঘরেই আছে।

কেউ ঢুকল না হুড়মুড় করে। বাইরেটা একেবারে ফাঁকা। রান্নাঘরের একতলার ছাদে কেউ নেই। মোটা একটা কাছির মতো কী যেন ঝুলছে! একটু আগে সব কালো ছিল, এখন ধীরে ধীরে সব সাদা হতে শুরু করেছে। শীত-শীত ভাব। দু'হাত বাড়িয়ে মা আসছেন।

"তুলেছিস তুই? তুই তুলেছিস?"

পলাশ জোর গলায় বললে, "কী তুলব? কী তোলার কথা বলছ?"

"ফুল তুলেছিস? তোকে বলেছিলুম। ফুল তুলেছিস, ফুল।"

পলাশ এতক্ষণ পালাতে চাইছিল মায়ের কাছে থেকে দূরে। ভয়ে। ভয় কেটে গেছে। মায়ের অবস্থা দেখে তার চোখে জল এসে গেছে। এখন অন্য ভয়। এখন সে কী করবে! কোথায় যাবে! কোনও ডাক্তার ডেকে মা'কে দেখাবে। দেড়খানা পা, এত বড় পৃথিবী, টাকা পয়সা কোথায় কী আছে, কিছুই জানে না সে, আপনার জন বলতে কেউ নেই পাশে, কী হবে এখন! শোভনা হঠাৎ ধপাস করে বসে পড়লেন রকের একপাশে। বসেই হাউহাউ করে কাঁদতে লাগলেন, "আমার ফুল তোলেনি, আমার ফুল তোলা হয়নি।"

পড়ার ঘরে বাবার ছবি। বাবার প্রায় সব জিনিসই ও-ঘরে। পলাশের ধারণা ওই ঘরে বাবা এখনও আছেন। যে চোখ থাকলে মৃত্যুর পরও মানুষকে দেখা যায়, সেই চোখ নেই বলেই তারা দেখতে পায় না। গভীর রাতে পলাশ পরিচিত অনেক শব্দ শুনতে পায়। আচমকা ওই ঘরে ঢুকে বহু সময় তার মনে হয়েছে, কিছু একটা হচ্ছিল, এইমাত্র বন্ধ হয়ে গেল।

পলাশ ধীরে-ধীরে, পা টেনে-টেনে, পড়ার ঘরে গিয়ে ঢুকল। বিশাল বড় তালা ভেঙে পড়ে আছে একপাশে। ছিটকিনি খোলা, তবে দরজা ভেজানো। পলাশ নিশ্বাস বন্ধ করে

বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। ঘরে ঢুকে যা দেখবে, তা সে দেখতে চায় না। চোখ খুলেই প্রথমেই সে দেখতে পেল বাবার ছবি। সামনের দেওয়ালে হাসছেন তিনি। ছবিটা যে-দিন তোলা হয়েছিল তার আগের দিন পলাশের পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছিল। তার আগের বার পলাশ মাত্র একটা নম্বরের জন্যে সেকেণ্ড হয়ে গিয়েছিল। অজয় হয়েছিল ফার্স্ট। বাবা বলেছিলেন, 'পলাশ, পরীক্ষা ফুটবল খেলার মতো। কত কষ্ট করে কাটিয়েকুটিয়ে বহু কাণ্ড করে খেলোয়াড় বিপক্ষের গোলের মুখে এল। বলও মারল, সর্বশক্তি দিয়ে জোর এক শট। একচুল ওপর দিয়ে বল চলে গেল গোলের বাইরে। খেলোয়াড়ের কোনও ত্রুটি ছিল না। সবই সে ঠিক ঠিক করেছিল; কিন্তু ভাগ্য। মনে মনে তৈরি হও। সামনের বার আরও সাবধানে বল মেরো।' পলাশ তাই করেছিল। অজয়ের চেয়ে দশ নম্বর বেশি পেয়ে ফার্স্ট হয়েছিল। বাবার সেই আনন্দটাই ছবিতে ধরা আছে। তার বাবার কাছে লেখাপড়ার চেয়ে আনন্দের আর কিছু ছিল না।

সারা ঘরে চোখ বোলাল পলাশ। সবই তো ঠিক আছে মনে হচ্ছে। বইয়ের আলমারি, দেরাজ। এ-ঘরে অবশ্য নেবার মতো কিছু নেই। খুব শিক্ষিত ডাকাত না হলে বই চুরি করবে না। হঠাৎ পলাশের চোখ চলে গেল টেবিলের দিকে। একগাদা নোট আর খুচরো পয়সা এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে। চেয়ারে বসে পলাশ গুনতে লাগল। তিনটে একশো টাকার নোট, বাকি সব খুচরো। কুড়ি আছে, দশ আছে, পাঁচ আছে। সব মিলিয়ে সাড়ে সাতশো টাকা। কী আশ্চর্য! এত টাকা এল কোথা থেকে! বাবার বইয়ের আলমারিতে ছিল! লেখার টেবিলের ড্রয়ারে ছিল! কোথায় ছিল! যদি বেরই করল, নিয়ে গেল না কেন এখন যা কিছু ঘটছে, সবই ভাবনা-চিন্তার বাইরে। টাকাগুলো একটা খামে ভরে পলাশ ড্রয়ারে তুলে রাখল।

বাইরের রকে মা বসে আছেন। কান্না থেমেছে, কিন্তু চোখমুখ মোটেই স্বাভাবিক নয়। এই রকম চোখ পলাশ দেখেছে আগে। দক্ষিণেশ্বর কালী-মন্দিরে। পঞ্চবটীতলায় বসেছিলেন। গেরুয়া শাড়ি পরে। মনে পড়ছে! পলাশের দিকে বহুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর, অদ্ভুত হেসে তিনি বলেছিলেন, 'ফুরিয়ে গেছে।' পলাশ সাহস করে জিজ্ঞেস করতে পারেনি, কী ফুরিয়ে গেছে!

পলাশ আবার তাকাতে তিনি গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন, 'সব ফুরিয়ে গেছে।'

রকে বসে মা আপন মনে বলেই চলেছেন, 'এসে গেছ! এসেছ। এসে গেছ।' বলতে বলতেই গুনগুন করে গান ধরলেন, 'আমার আঁধার ঘরের প্রদীপ। মাকে কোনও দিন সে গান গাইতে শোনেনি। এই দুঃখেও পলাশের মনে হল, কী সুন্দর গলা! মা এই গান শিখলেন কোথা থেকে, 'আমার আঁধার ঘরের প্রদীপ যদি নাই বা জ্বলে।

পলাশ সারা বাড়িটা একবার ঘুরে এল। কাল রাতে মুখোশপরা পাঁচটা ডাকাত সত্যিই কি ঢুকেছিল! স্বপ্ন নয় তো! পলাশের এখন অবিশ্বাস হচ্ছে। তা হলে এই দড়িটা! রান্নাঘরের ছাদ থেকে ঝুলে থাকা মোটা দড়িটাই প্রমাণ। আবার অবিশ্বাসও হচ্ছে, এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত কাপড় শুকোতে দেবার যে দড়িটা খাটানো ছিল, সেই দড়িটা গেল কোথায়। সেটা তো নেই। সেইটাই কি এইটা? পলাশ হাঁ করে দেখতে লাগল। তার সবই গুলিয়ে যাচ্ছে। মায়ের দিকে তাকাল। মা কি সুস্থ! গান বন্ধ হয়েছে।

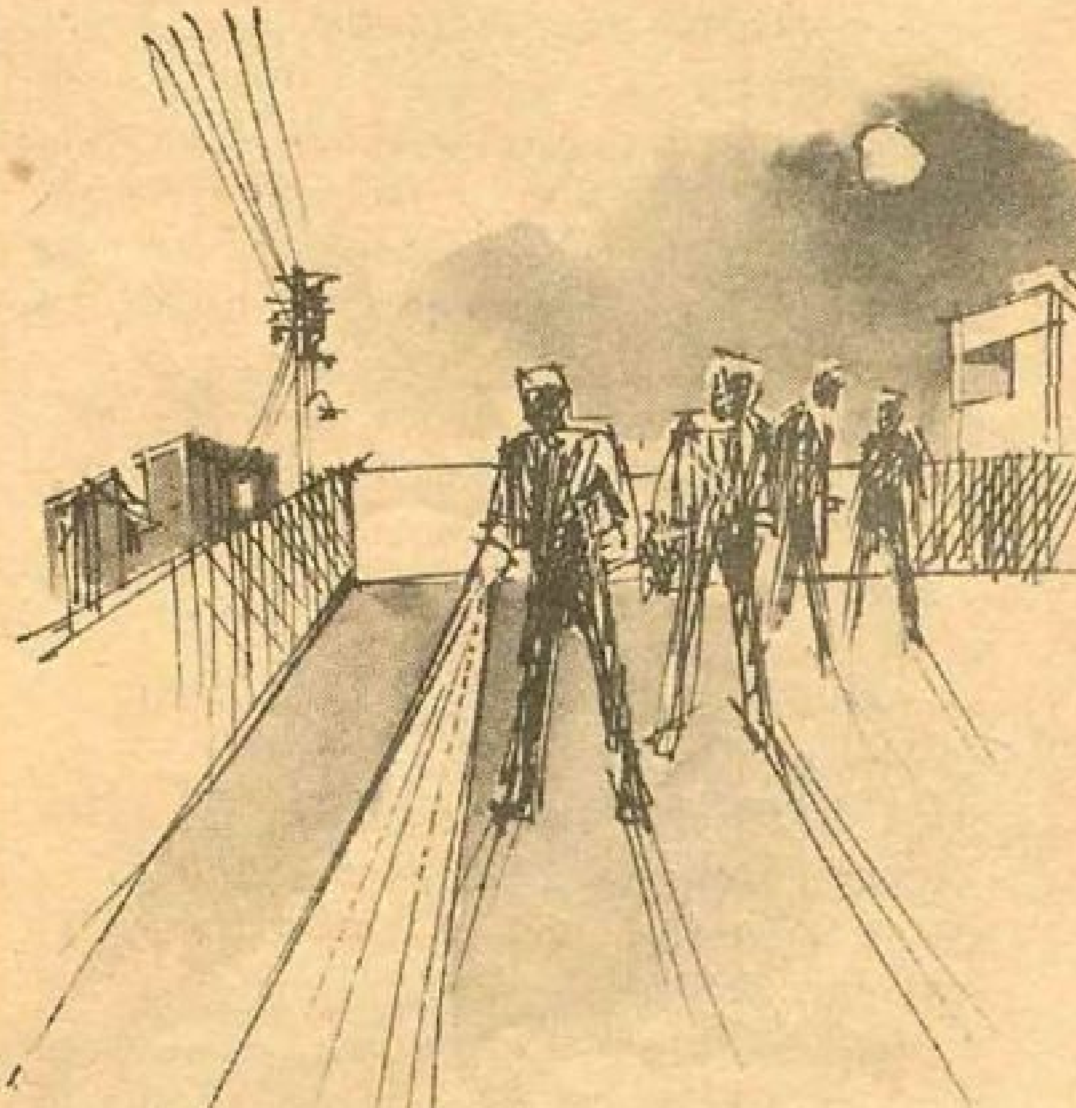

পলাশ অনেক আশা নিয়ে ডাকল, "মা, মা গো।"

শোভনা তাকালেন। পলাশের মনে হল, সুস্থ, স্বাভাবিক। ভাবছে এইবার হয়তো বলবেন, 'বল খোকা!' চোখে চোখ রেখে ধীরে পলাশ ডাকল আবার, "মা।"

শোভনা যেন দপ করে জ্বলে উঠলেন, "বেরিয়ে যা, তুই বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে।" পাশেই ছিল প্লাস্টিকের মগ। সেইটা তুলেই ছুঁড়লেন ছেলের দিকে।

৭

পলাশ রিকশাঅলাকে বললে, "আমার মনে হচ্ছে ডানদিকের এই রাস্তাটা।"

লোকটি তিরতির নদীর মতো ছুটছিল। পলাশ হালকা। রিকশা যেন হাওয়ায় উড়ে চলেছে পক্ষিরাজের মতো। এখনও তেমন বেলা হয়নি। রাস্তায় লোকজন, গাড়িঘোড়ার অভাব নেই, তবে বাইরেটা বেশ ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা। ঘ্যাঁঘোঁ প্যাঁপোঁ তেমন শুরু হয়নি। হবে আর একটু বেলায়।

রিকশাঅলা বললে, "খোকাবাবু, তুমি রাস্তার নাম জানো না, ঠিকানা জানো না। এত বড় শহরে শুধু নাম বললে খুঁজে পাওয়া যায়!"

পলাশের দু' হাঁটুর মাঝখানে সেই লাঠিটা, যেটা ধরে সে ক'দিন ধরে চলা অভ্যাস করছিল। ডানদিকের রাস্তায় রিকশা ঢুকল। পলাশ এখন আর কিছু ভাবতে পারছে না। সে কেমন যেন হয়ে গেছে। মায়ের কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে তার একমাত্র মামাকে চিঠি লিখেছিল। প্রায় দেড় মাস হয়ে গেল, কোনও উত্তর নেই। হয় ঠিকানা ভুল ছিল, না হয় মামা পাত্তাই দিলেন

না। মামাকে সে একবারই দেখেছে। বহু বছর আগে মা'কে দিয়ে একটা কাগজ সই করাতে এসে ভীষণ ঝগড়া করে চলে গিয়েছিলেন। বাবা মারা যাবার পর একদিনও আসেননি। তবু পলাশ চিঠি লিখেছিল।

মহাকালী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের সামনে গাড়ি দাঁড় করাতে বলে, পলাশ না নেমেই জিজ্ঞেস করল, "বিমান ঘোষের বাড়ি জানেন?"

"কোন্ বিমান ঘোষ?"

"ওই যে সেতার, তানপুরা সব তৈরি হয়।"

"অ, বিমান সেতারি!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তিনি আমার গুরু। তুমি জানো না?"

পলাশ খুব ভয় পেয়ে গেল। রিকশাঅলা গামছা দিয়ে মুখের কপালের ঘাম মুছছে।"

"তুমি কোথা থেকে আসছ? তুমি তাঁর কে হও?"

"আমার বাবার বন্ধু, আমি তাঁকে দাদু বলি।"

"কে তোমার বাবা?"

"আমার বাবার নাম শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়।"

"ও, তুমি তাঁর ছেলে! তিনি তো মারা গেছেন, আমি তাঁর ছাত্র ছিলাম। তুমিই তো সেই গাড়ি চাপা পড়েছিলে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তুমি নেমে এসো। রিকশা-ভাই, তুমি একটু নামাও তো।"

পলাশ কষ্টেসৃষ্টে লাঠিতে ভর দিয়ে নেমে এল।

"তোমার পা ঠিক হল না?"

"আজ্ঞে না। ও আর ঠিক হবে না।"

"আঃ, দ্যাখোদিকিনি কী গেরো! একের পর এক বিপদ। আর বাবা মানুষের ভাগ্যে যা আছে, কেউ খণ্ডাতে পারবে না। কেউ খণ্ডাতে পারবে না।"

রিকশাঅলা বললে, "খোকাবাবু, তুমি আমাকে ছেড়ে দাও।"

মিষ্টির দোকানের মালিক বললেন, "ছেড়ে দিলে যাবে কী করে! দেখছিস পায়ে চোট আছে।"

"উপায় নেই বাবু। অনেকক্ষণ ঘুরছি, আমার আবার বাঁধা ভাড়া আছে। একটা বাচ্চাকে ইশকুলে নিয়ে যেতে হবে।"

পলাশ ভাড়া মিটিয়ে দিল। যা হয় হবে। এই তো সুযোগ। যত কষ্টই হোক, আজ সে লাঠি ধরে হাঁটবে। হেঁটে ফিরবে। পলাশ দোকানের চেয়ারে বসতে বসতে বললে, "বিমানদাদুর কী হয়েছে?"

"বিমানবাবুর ভায়েরা মেরেধরে বিমানবাবুকে দূর করে দিয়েছে। তাঁর কারখানা ভেঙেচুরে তছনছ করে সর্বনাশ করে দিয়েছে। বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপার রে বাবা। বিষয় বিষ। বিমানবাবু পাড়া ছেড়ে চলে গেছেন।"

"কোথায় গেছেন জানেন? আমার যে ভীষণ দরকার তাঁকে।"

পলাশ প্রায় কাঁদো-কাঁদো। মা'কে একটা ঘরে তালা-বন্ধ করে রেখে বিমানদাদুর খোঁজে বেরিয়েছিল। এইবার সে কী করবে!

দোকানের মালিক বললেন, "কোথায় গেছেন জানি না, তবে আমাকে বলে গেছেন, একটা আস্তানা পেলে আমাকে চিঠি লিখে জানাবেন। এত করে বললুম, আমার কাছে থাকুন, শুনলেন না।"

পলাশ গুম মেরে বসে রইল বেশ কিছুক্ষণ। কী করবে সে এখন! কার কাছে যাবে! দোকান বেশ চালু। মাঝে-মাঝেই

গুণের জন্যে আজ সবার প্রিয়

পি বি এম

আর্ণিকা হেয়ার অয়েল

বিশ্ববিখ্যাত হোমিওপ্যাথ
মিহিজামের ডাঃ পি. ব্যানার্জীর আবিষ্কৃত ফর্মূলায় প্রস্তুত

পি. ব্যানার্জী মিহিজাম

১০৯ ডি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬
ফোন নং ৪৬-৩০৫২

ভিড় জমে যাচ্ছে। হরেক ফরমাশ। কারও দই, কারও সন্দেশ। মালিক আর কর্মচারীদের হিমশিম অবস্থা।

লাঠিতে ভর দিয়ে পলাশ উঠে দাঁড়াল।

"আমি তা হলে আসি।"

দোকানের মালিকের আর কথা বলার ফুরসত নেই। পয়সা ফেরত দিতে দিতে কোনওরকমে বললেন, "এসো, এসো। পরে এসে একবার খবর নিও। মনে হচ্ছে দু-এক দিনের মধ্যেই চিঠি এসে যাবে।" বাইরে চড়চড়ে রোদ। গাড়ি-ঘোড়া, লোকজন, হইহল্লা। পলাশ যেন দিশাহারা। এতকাল দু'পায়ে হেঁটে এসেছে। এখন দেড় পায়ে বেশ ভয়-ভয় করছে। মনে হচ্ছে, পাশ দিয়ে যাবার সময় কেউ যদি ধাক্কা মারে উল্টে পড়ে যাবে। সামলাতে পারবে না। বেশ কিছু দূর হেঁটে আসার পর পলাশ রাস্তার পাশে ছায়ায় দাঁড়িয়ে পড়ল। বেশ কষ্ট হচ্ছে। ঘেমে গেছে। কোথায় সে যাচ্ছে? কোথায় তার যাওয়া উচিত এখন। আপনজন তো তার কেউ নেই, একেবারে একা। কেউ আর বলবে না, পলাশ এই করো, ওই করো। তোমার এখন এই করা উচিত। কেউ বলবে না। পলাশের চোখে জল এসে গেল। জীবনে ক্লাসে ওঠার অনেক পরীক্ষা সে দিয়েছে। এমন পরীক্ষা তাকে যে দিতে হবে জানা ছিল না। কোনও বই নেই যে, রাত জেগে পড়ে পাশ করবে।

খুব সুন্দর চেহারার এক ভদ্রলোক যেতে যেতে হঠাৎ তার দিকে ফিরে তাকালেন। থমকে দাঁড়ালেন, "কী হয়েছে তোমার? ইজ এনি থিং রং।"

পলাশ লজ্জায় পড়ে গেল। কী উত্তর দেবে ভেবে পেল না। কোনওরকমে বললে, "না এমনি। আমার ডান পা'টা ভাঙা তো, তাই হাঁটতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে।"

"কোথায় যাবে তুমি?"

পলাশ আবার বিপদে পড়ে গেল। কী বলবে! কোথায় সে যেতে চায় জানা নেই। মনে মনে সে শ্যামলীদের বাড়িতে যাবার কথাই ভাবছিল।

তার ইতস্তত ভাব দেখে ভদ্রলোক বললেন, "ইউ আর ইন ট্রাবল। তুমি আমার সঙ্গে এসো। ভয় নেই। আমি একজন ডাক্তার। তুমি ডাক্তারদের খবর রাখো না, তা না হলে নাম বললে তুমি চিনতে পারতে। ওই আমার বাড়ি। চলো, তুমি যেখানে যেতে চাইবে সেইখানেই তোমাকে আমি পৌঁছে দিয়ে আসব।"

পলাশ ডাক্তারবাবুর সঙ্গে গাড়িতে চেপে বসল। স্টার্ট দিতে দিতে ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "সম্প্রতি তোমার কেউ মারা গেছেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার বাবা মারা গেছেন।"

"তোমার বাবার নাম?"

"শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়।"

ডাক্তারবাবু স্টার্ট বন্ধ করে পলাশের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি সারের ছেলে! কী হয়েছে তোমার? তুমি কোথায় গিয়েছিলে? পথের পাশে দাঁড়িয়ে তুমি কাঁদছিলে কেন?"

পলাশ ধীরে-ধীরে সব বলল। বলতে বলতে, আবার তার চোখে জল এসে গেল।

ডাক্তারবাবু পলাশের ঘামে ভেজা পিঠে হাত রাখলেন, "আমার নাম প্রশান্ত বোস। তোমার বাবা আমাকে পড়াতেন। আমি তাঁর প্রিয় ছাত্র ছিলুম। তোমাকে আমি খুব ছোট দেখে বিলেতে চলে গিয়েছিলুম। তুমি এখন অনেক বড় হয়ে গেছ। তোমার মায়ের কেন এমন হয়েছে জানো, শক, প্রচণ্ড মানসিক আঘাতে হয়েছে। তুমি কিচ্ছু ভেবো না, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি ঠিক করে দোব। চলো।"

গাড়ি চলতে শুরু করল। পলাশ আড়চোখে ডাক্তারবাবুকে দেখছে। বড় সুন্দর দেখতে। তার যদি এমন একজন দাদা থাকত। মানুষের কত কী থাকে, তার কিছুই নেই। দুটো পা ছিল, তাও আবার একটা চলে গেল। কোনওদিন কোনও জ্যোতিষী পেলে হাতটা একবার দেখাবে। এখন তো ভিক্ষে করা ছাড়া তার সামনে আর কোনও রাস্তা খোলা নেই। গান গেয়ে গেয়ে ট্রেনের কামরায় কামরায় ভিক্ষে। প্ল্যাটফর্মে শুয়ে থাকবে। সেই ভাল। বাবা যদি তাই চান, তবে তাই হোক। তবে তাই হোক।

ডক্টর বোস বললেন, "তোমার পা'টা ঠিক করা গেল না?"

"অনেক তো চেষ্টা হল, দিন-দিন সরু হয়ে যাচ্ছে।"

"আচ্ছা, তোমার ওই অ্যাকসিডেন্টের পর কোনওদিন কি জ্বর হয়েছিল?"

পলাশ একটু ভেবে বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ। খুব জ্বর হয়েছিল।"

"আচ্ছা, এইবার মনে করে দ্যাখো তো, ওই জ্বরের পরই কি তোমার পা সরু হতে আরম্ভ করেছে।"

পলাশ ভাবতে লাগল। গাড়ি চলেছে বাড়ির দিকে। পলাশ ভাবছে, হ্যাঁ, ঠিকই তো! "আজ্ঞে হ্যাঁ, তার পরই পায়ের অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে।"

ডক্টর বোসের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল।

পলাশ ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করলে, "আর তা হলে ভাল হবে না, তাই না ডাক্তারবাবু?"

ডাক্তারবাবু জোর করে হাসলেন। কী করে বোঝাবেন ছেলেটাকে, যে, তার পোলিও হয়ে গেছে, অ্যাডাল্ট পোলিও। পলাশকে বললেন, "ভগবানকে মানো? বিশ্বাস আছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তা হলে জেনে রাখো, তাঁর অসাধ্য কিছু নেই। তাঁর কৃপায় সবই হয়।"

"আমার পা ভাল হবে ডাক্তারবাবু? আপনার কী মনে হয়?"

"ধরো যদি ভাল না-ই হয়, তাতেই বা কী? তুমি আমুণ্ডসেনের নাম শুনেছ? এক সাহসী অভিযাত্রী। ফ্রস্টবাইটে তাঁর দুটো পায়ের সব ক'টা আঙুল কেটে বাদ দিতে হয়েছিল। বিশেষ এক ধরনের বুট পরে তিনি হাঁটা-চলা করতেন। তুমি ভাবতে পারো, যাঁর পায়ের আঙুল নেই, কোনও গ্রিপ নেই, তিনি কোন সাহসে পৃথিবীর দুর্গমতম অভিযানে যেতেন! মনের জোরে। হারব না। সেই কারণে ঈশ্বরের কাছে আমাদের প্রার্থনা কী হবে জানো? প্রভু, তুমি আমার সব কেড়ে নাও, শুধু মনের জোরটা কেড়ে নিও না। রবীন্দ্রনাথের সেই গান তোমার মনে আছে?"

"কোন্ গান?"

"বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা, বিপদে আমি না যেন করি ভয়।"

পলাশ বললে, "দুঃখতাপে ব্যথিত চিতে নাই বা দিলে সান্ত্বনা, দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।"

মানুষের মুখে মাঝে-মাঝে এক ধরনের আলো ফুটে ওঠে, স্বর্গীয় আলো। ডাক্তার বোসের মুখে সেই ধরনের আলো খেলে গেল। তিনি আপন মনে বলতে লাগলেন, "সহায় মোর না যদি

জুটে নিজের বল না যেন টুটে/ সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি, লভিলে শুধু বঞ্চনা। নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।"

ডাক্তারবাবুর পাশে বসে পলাশের এখন বেশ সুন্দর লাগছে বেশ সাহস আসছে মনে। একটু আগে মনে হচ্ছিল তার কেউ নেই। এখন মনে হচ্ছে তার ভগবান আছেন, যাঁর অসীম শক্তি।

ডক্টর বোস বললেন, "জানো পলাশ, তোমার যেমন একটা পা, আমার সেইরকম একটা চোখ নেই। আমার বাঁ চোখটা পাথরের। বিদেশে তৈরি, তাই ভাল ভাবে না দেখলে বোঝা যায় না। তুমি কি জানো, পৃথিবীর এক বিখ্যাত ক্রিকেটারের চোখ পাথরের। তুমি কি জানো, এমন অনেকে আছেন যাঁদের দুটো হাত অকেজো, কিন্তু ঠোঁটে তুলি ধরে অসাধারণ ছবি আঁকেন। শিল্পী বিনোদবিহারী সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যাবার পরও কত অসাধারণ ছবি এঁকেছেন। এই তো সেদিন ফাইন আর্টসে একটা প্রদর্শনী দেখে এলাম। অন্ধ শিল্পী কী অসাধারণ মূর্তি গড়েছেন। আমাদের সামনে বসে মূর্তি গড়ে দেখালেন। পলাশ, এই পৃথিবী এক অদ্ভুত জায়গা! কার যে কখন কী হবে! যাই হোক, সব মেনে নিতে হবে। মানিয়ে নিতে হবে। দুর্ঘটনায় চোখটা চলে যাবার পর মনে হয়েছিল বেঁচে থেকে কী হবে! আত্মহত্যা করে ফেলি। বিলেতে আমার অধ্যাপক বললেন, ইউ আর অ্যান অ্যাশ। তুমি একটা গাধা। ঈশ্বর আমাদের দুটো চোখ কেন দিয়েছেন! ইফ ওয়ান গোজ, দি আদার ইজ এ স্পেয়ার। একটা গেলে আর-একটা আছে। ওই একটাকে তুমি এমন ভাবে তৈরি করো, যেন দুটোর কাজ করে।"

কথায়-কথায় বাড়ি এসে গেল। রাস্তার একধারে গাড়ি রেখে ডাক্তারবাবু ব্যাগ হাতে নেমে এলেন। পলাশকে বললেন, "তোমাকে আমি ধরব না। তুমি নিজে-নিজে নামবে, দরজা বন্ধ করবে। কষ্ট হবে। তা হোক।"

আজ অক্ষয়বাবুর দোকান বন্ধ। পলাশ নামতে-নামতে দেখে নিল। যাক, বিমানদাদু বেপাত্তা, অক্ষয়জেঠু অনুপস্থিত। আজ যেন পলাশের প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা! পৈতের সঙ্গে চাবি বাঁধা ছিল। সেই চাবি দিয়ে পলাশ তালা খুলছে। ডক্টর বোস বললেন, "তুমি কি মা'কে একলা রেখে তালা বন্ধ করে বেরিয়েছিলে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"ইশ, কাজটা খুব ভাল করোনি। মনের এই অবস্থায় মানুষ আত্মহত্যার চেষ্টা করতে পারে।"

তালাটা খুলে মেঝেতে পড়ে গেল। আর একটু হলে পায়ের আঙুলে পড়ে যেত। ডক্টর বোস নিচু হয়ে তালাটা তুলে নিলেন। দরজার দুটো পাল্লাই হাট খুলে গেছে। ভেতরটা একেবারে নিস্তব্ধ। পলাশের বুকের ভেতরটা ছাঁত করে উঠল। মা আছেন তো? বাবার পড়ার ঘরে মা'কে পুরে তালা দিয়ে গিয়েছিল পলাশ।

ডক্টর বোস বললেন, "ভয় পাচ্ছ? ভয় পাবার কিছু নেই। মা কোথায়?"

পলাশ আঙুল তুলে উঠোনের ওপাশের ঘরটা দেখাল।

"ওখানেও তালা! করেছ কী?"

পলাশ গুটিগুটি ভেতরে ঢুকল। কী নিস্তব্ধ চারপাশ! কোথাও একটা পাখি পর্যন্ত ডাকছে না। অন্য দিন তিন-চারটে কাক এসে রান্নাঘরের ছাদে বসে খাখা করে। আজ তারাও নেই। একটা বেড়াল পায়ে-পায়ে ম্যাও-ম্যাও করে বেড়ায়। বেড়ালটাও নেই। শুধু পলাশের হাঁটার তালে-তালে লাঠিটার খটখট শব্দ হচ্ছে।

পড়ার ঘরের খোলা জানালার সামনে পলাশ কিছুক্ষণ দাঁড়াল। উঁকি মারতে ভয় করছে। ওপর দিকে তাকাল। পাখাটাই শুধু ঝুলছে। পলাশ জানালার কাছে সরে গিয়ে ভেতরে তাকাল। একপাশে দেয়ালে পিঠ দিয়ে, সামনে পা ছড়িয়ে মা বসে আছেন। দেয়াল থেকে কীভাবে বাবার ছবিটা নামিয়েছেন। অনেক উঁচুতে টাঙানো ছিল। সেই ছবিটা কোলের ওপর রেখে চোখ বুজে মা নিথর।

ডক্টর বোস বললেন, "ঘুমিয়ে পড়েছেন। শব্দ না করে দরজার তালা খোলো। আমাকে বরং চাবিটা দাও।"

প্রশান্ত বোস কোনওরকম শব্দ না করে ধীরে তালা খুলে ফেললেন। পলাশের ভয় এখনও পুরোপুরি কাটেনি। বলা তো যায় না, মা হয়তো বসে-বসেই মারা গেছেন। এই ঘরে বাবার আলমারিতে অনেক রকমের ওষুধবিষুধ আছে। তার কোনটায় কী হয়, পলাশের জানা নেই।

ডক্টর বোস ছবিটা সাবধানে কোল থেকে তুলে নিলেন। তবু শোভনার ঘুম ভাঙল না। পলাশ লক্ষ করেছে, মায়ের নিশ্বাস পড়ছে। বড় সুন্দর দেখাচ্ছে মা'কে।

প্রশান্ত বোস পাশে বসে ডাকলেন, "মা, মা।"

এত সুন্দর করে যে মা বলা যায়, পলাশের জানা ছিল না। কোনওদিন শোনেনি এমন ডাক। তিন-চারবার ডাকার পর শোভনা কষ্টে চোখ খুললেন, তারপর এদিক-ওদিক তাকাতে-তাকাতে বললেন, "এসে গেছে, বরযাত্রীরা সব এসে গেছে।"

ডাক্তার বোস বললেন, "হ্যাঁ মা, সবাই এসে গেছেন, আপনি এবার উঠুন।"

"তোমার মাথায় টোপর কই! অ্যাঁ, টোপর কই!"

"আমি ওঘরে খুলে রেখে এসেছি মা।"

"না না না, খুলতে নেই, খুলতে নেই। খুললেই আগুন লেগে যায়। জানো না তুমি, প্রভাকরের বাড়িতে আগুন লেগে গেল। কামিনী পুড়ে মারা গেল। তোমার টোপরে কি আগুন ধরেছে, না ইঁদুর ঢুকেছে।"

"আপনি উঠুন তো মা, একটু উঠুন।"

পলাশ হাঁ করে দেখছে আর শুনছে। মা'কে একেবারে অচেনা লাগছে। চোখ দুটো কেমন যেন হয়ে গেছে। এলোচুল চারপাশে ছড়িয়ে গেছে। মুখটা কালচে দেখাচ্ছে। এপাশে-ওপাশে ঘন ঘন তাকাচ্ছেন। কিসের যেন ভয়! হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়েই বললেন, "অনেক দূরে যেতে হবে। গাড়ি কোথায়! সে যে গাড়ি আনতে গেল এই আসছি বলে, গাড়ি কোথায়! আমার গাড়ি!"

প্রশান্ত বোস বললেন, "গাড়ি আছে মা। গাড়ি এসে গেছে।"

"তা হলে চলো, লাটসায়েবের বাড়ি থেকে বেড়িয়ে আসি। আমার বেনারসি? আমার বেনারসি কোথায়? ঊষা, আমার বেনারসি কোথায়?"

"সব ও-ঘরে আছে মা। আপনি চলুন।"

"তুমি শরবত খেয়েছ?"

"এইবার খাব। আপনার খাওয়া হলে খাব।"

শোভনা নিজেই হনহন করে হেঁটে শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। ডক্টর বোস পলাশকে ফিসফিস করে বলে গেলেন, "এক গ্লাস জল নিয়ে এসো। শক্ত করো, নিজেকে শক্ত করো।"

এই একটা কথা শুনলে পলাশের সাঙ্ঘাতিক রাগ হয় আজকাল, শক্ত করো, শক্ত করো, ভেঙে পোড়ো না! ওই তো আখরোট, অত শক্ত, তবু ভেঙে যায়। হাতুড়ির ঘায়ে শেষ

পর্যন্ত শক্ত দুটো খোলা, দু'দিকে ঠিকরে চলে যায়।

জল গড়াতে গিয়ে পলাশ আবিষ্কার করল, সে আর উবু হয়ে বসতে পর্যন্ত পারছে না। ভালই হল। মন শক্ত করো পলাশ। মন শক্ত করো। ভেঙে পোড়ো না।

ডাক্তার বোস বললেন, "গেলাসটা আমার হাতে দাও। আর দু'চামচ চিনি আনো।"

জলে চিনি গুলে তাতেই দুটো ট্যাবলেট ছেড়ে দিলেন। ধীরে-ধীরে ট্যাবলেট দুটো গুলে গেল। শোভনার হাতে দিয়ে বললেন, "মা, শরবতটা শিগগির খেয়ে নিন। গাড়ি এসে গেছে, আমরা লাটসায়েবের বাড়ি যাব।"

"তুমি কে? তুমি কি শ্মশানে কাঠ বিক্রি করো?"

"হ্যাঁ মা।"

"চন্দন-কাঠ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তুমি আমাকে চন্দন-কাঠে পোড়াবে, কেমন?"

"হ্যাঁ মা, তাই পোড়াব।"

"এটা কী দিলে, বিষ?"

"না মা, শরবত।"

শোভনা খিলখিল করে হেসে উঠলেন। এমন হাসি পলাশ কখনও শোনেনি। গা হিম করে দেবার মতো হাসি। রাতে শুনলে ভয়ে পালাতে হবে।

হাসি থামিয়ে শোভনা বললেন, "ওরকম সবাই বলে। শরবত বলে বিষ খাইয়ে দেয়। পল্টুবাবুকে খাইয়ে ছিল। আমি জানি, সব জানি। ওটা কে! কে ওখানে?"

শোভনা পলাশকে চিনতে পারছেন না।

চোখ বড়-বড় করে চিৎকার করে উঠলেন, "যা, চলে যা। যমের দোসর। আমি এখন মরব না। যা, পালা।" হাতের ইশারায় ডক্টর বোস পলাশকে সরে যেতে বললেন। আর সঙ্গে সঙ্গে খালি গেলাসটা শোভনা পলাশকে ছুঁড়ে মারলেন। স্টিলের গেলাস পলাশের কপালের ডানপাশে লেগে ছিটকে চলে গেল বাইরে। জোর লেগেছে। তাড়াতাড়ি সরে যেতে যেতে বুঝতে পারল, কপাল থেকে গালের পাশ বেয়ে কিছু একটা নামছে। আঙুল দিয়ে দেখল, রক্ত। গেলাসের কোনা লেগে কপালটা ফালা হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ পরে দরজা বন্ধ করে ডক্টর বোস বেরিয়ে এলেন। মুখ গম্ভীর। "দেখি তোমার কপালটা ড্রেস করে দি।"

পলাশ কেঁদে ফেলল। এতদিন বহু কান্না জমেছিল ভেতরে। সব আজ ঠেলে বেরিয়ে এল! কীভাবে মরতে হয় জানা নেই। থাকলে এই মুহূর্তে সে মরার চেষ্টা করত।

"ইশ, অনেকটা গেছে। কেঁদো না, কেঁদো না। চোখের জল বন্ধ করো। তুমি পুরুষ মানুষ! জানবে, বিপদ যেমনই হোক, তা একদিন কেটে যাবেই। যেমন রাত যত গভীরই হোক, ভোর এক সময় হবেই। যা কিছু দেখছ, সবই বিসর্জনের ব্যাণ্ডপার্টি। বুঝলে, ভ্যাঁপ্‌পোর ভ্যাঁপ্‌পোর করে, জীবনের পথ ধরে চলে যাবে। ঝালাপালা করে দেবে। দিক। কুছ পরোয়া নেহি। এই গানটা জানো?

জাগো নির্মল নেত্রে রাত্রির পরপারে
জাগো অন্তরক্ষেত্রে মুক্তির অধিকারে ॥
জাগো ভক্তির তীর্থে পূজাপুষ্পের ঘ্রাণে
জাগো উন্মুখচিত্তে, জাগো অম্লান প্রাণে
জাগো নন্দননৃত্যে সুধাসিন্ধুর ধারে
জাগো স্বার্থের প্রান্তে প্রেমমন্দির দ্বারে ॥

প্রশান্ত বোসের অপূর্ব সুন্দর গলা। ফাটা কপালের জ্বালাটালা সব ভুল হয়ে গেল। ডক্টর বোস ব্যাণ্ডেজ শেষ

করে বললেন, "এইবার দু'চারটে কাজের কথা! তোমাদের আত্মীয়স্বজন কেউ নেই?"

"তেমন কেউ নেই। থাকলেও আসেন না।"

"মা'কে আমি ঘুমের ওষুধ দিয়েছি। ধরো, সারা দিনই ঘুমোবেন। তারপর? এক সময় ঘুম তো ভাঙবেই। তখন! এ অসুখের যে তেমন কোনও চিকিৎসা নেই। এখন কী করা যায়?"

পলাশ হাঁ করে তাকিয়ে রইল ডাক্তারবাবুর মুখের দিকে।

"একটাই মাত্র পথ, মেন্টাল হোমে দিয়ে দেওয়া। সে বড় কষ্টের। তার চেয়ে মেরে ফেলা ভাল।"

পলাশ প্রায় চিৎকার করে উঠল, "না, না।"

ডক্টর বোস হাত তুললেন, "না, তা হতে পারে না। তা হলে কী হবে! তুমিও ভাবো। আমিও ভাবি। আপাতত আমি আমার কাজে চললুম। ভেবো না, পালাচ্ছি। আমি বিকেলে আবার আসব। শান্তিতে ঘুমোতে দাও। তোমার এখন কী কাজ?"

পলাশ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। তার তো অনেক কাজ। পলাশ বলল, "মা কী খাবেন?"

"তুমি পারবে না। আমি এসে ব্যবস্থা করব।"

"আপনার সময় হবে?"

"সময় করে নিতে হবে। তোমার মা আর আমার মা, বিশেষ তফাত আছে কি? তোমার খাওয়াদাওয়ার কী হবে?"

"আমি খাব না।"

"ওই ভুল কোরো না। রাঁধতে শেখো। তুমি জানো, তোমার তবু মা আছেন, আমার কেউ নেই। আমি একা। একলা চলো রে। স্টোভ জ্বালো। ভাতে ভাত বসিয়ে দাও। শরীরটাকে রাখতে হবে পলাশ। মনের হাতিয়ার হল শরীর। ফ্যান-ভাত, আর আলু-পটল ভাতে, নুন, আর কাঁচালঙ্কা, ফাস্ ক্লাস। চান করার সময় কপালের ব্যাণ্ডেজটা ভিজিয়ে ফেলো না। তা হলে শুকোতে দেরি হবে।"

৮

পলাশ চুপ করে বসে রইল অনেকক্ষণ। কী হয়ে গেল তার জীবনটা! স্কুল বন্ধ। বইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। বাবা চলে গেলেন। মায়ের ওই অবস্থা। বাড়িঅলা পেছনে লেগেছে। বিমানদাদু নিরুদ্দেশ। অক্ষয়কাকুর দোকান খোলার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। কিন্তু কী অদ্ভুত ভাবে প্রশান্তদার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

কেরোসিন-স্টোভ জ্বেলে রাঁধতে বসার কোনও ইচ্ছেই পলাশের নেই। রান্না কাকে বলে তার জানা নেই। এতকাল সে শুধু ভাল-মন্দ খেয়েই এসেছে। মায়ের রান্নার তো কোনও তুলনা হয় না। তা ছাড়া মা খাবেন না, সে কী করে একা-একা গপ্‌গপ্ করে খাবে। আজ তারও উপোস।

পলাশ ধীরে-ধীরে নিজের ডান পায়ের ওপর হাত বোলাচ্ছিল। বোলাতে বোলাতে ভাবছিল, ভগবান যদি সত্যিই থেকে থাকেন, তা হলে তার এই সাঙ্ঘাতিক বিপদের দিনে পা'টাকে কি ঠিক করে দিতে পারেন না! কীরকম ভগবান! তিনি তো সব দেখতে পাচ্ছেন। তিনি জানেন না, পলাশকে এখন কত হেঁটেচলে বেড়াতে হবে। এই তো এক্ষুনি বাবার স্কুলে যেতে পারলে ভাল হয়। বাবার পাওনা টাকা সব আটকে আছে। অনবরত না খোঁচালে ও-টাকা দশ বছরেও আদায় হবে না। মনে নেই বাবার বন্ধু জ্যোৎস্নাবাবু, অবসর নিলেন, তারপর পাওনা টাকা আর আদায় হল না। ঘুরে ঘুরে শেষে মারাই গেলেন।

পলাশ মনে মনে সঙ্কল্প করল, কাল আমি বাবার স্কুলে যাব। রোজ-রোজ যাব। সারা দিন বসে থাকব যত দিন না সব পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দিচ্ছে। আর তার স্কুলে যাবার কী হবে! পলাশ আর ভাবতে পারছে না। এইভাবে চুপ করে বসে থাকা যায়! সব এলোমেলো হয়ে আছে। ধুলো, আবর্জনা। নাঃ, যত কষ্টই হোক, সারা বাড়িটা আগে পরিষ্কার করা দরকার।

পলাশ বারান্দার পিলার ধরে উঠে দাঁড়াল। নাহ্, ডান পায়ে আর এতটুকু জোর নেই। গাছের ভাঙা ডালের মতো ল্যাতোরপ্যাতোর করছে। ওই পা নিয়ে সে কী কাজ করবে? এই মুহূর্তে তার মরা উচিত। কী হবে বেঁচে! যে হাঁটাচলা করতে পারবে না, খেলাখুলো করতে পারবে না, যার দ্বারা কোনও কাজই হবে না, তার বেঁচে থাকার কী মানে হয়। পলাশ আবার বসে পড়ল।

কে দরজার কড়া নাড়ছে। পলাশ দরজা খুলে অবাক হয়ে গেল। একেবারে অচেনা একজন মহিলা হাসি-হাসি মুখে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। হাতে একটা প্লাস্টিকের বড় ঝুড়ি ঝুলছে। মহিলা বললেন, "তুমি পলাশ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আমি তোমার দিদি। কীরকম দিদি? আমি প্রশান্তর বোন। কে প্রশান্ত? যে প্রশান্ত একটু আগে তোমাদের বাড়িতে এসেছিল। চলো, ভেতরে চলো।"

মহিলা মনে হয় ট্যাকসিতে এসেছিলেন। দূরে একটা গাড়ি গলি ছেড়ে বড় রাস্তার দিকে বাঁক নিচ্ছে। ভেতরে যেতে যেতে মহিলা বললেন, "প্রশান্তর হুকুমে আমি এখন এই বাড়ির ইনচার্জ। তোমার চান-খাওয়া হয়েছে?"

"না, দিদি।"

পলাশ বেশ সহজেই দিদি বলতে পারল। মহিলাকে দিদি বলতে ইচ্ছে করে। সাধারণ শাড়ি। সাজের কোনও ঘটা নেই। আর মুখটা কী সুন্দর! কী চমৎকার স্বাস্থ্য!

"প্রশান্ত বলেই ছিল, গিয়ে দেখবে উপোস করে বসে আছে। কপালে কী হল?"

"মা গেলাস ছুঁড়ে মেরেছেন।"

"বাঃ, একেই বলে, কার কপালে কী লেখা থাকে! মায়ের ঘুম ভাঙেনি তো?"

"না, একভাবে ঘুমোচ্ছেন।"

"বেশ, আমি তা হলে কাজে লেগে যাই। তুমি চান করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে এসো। ব্রাহ্মণের ছেলে, সন্ধ্যাহ্নিক করো? তর্পণ করো?"

পলাশ মাথা নিচু করে রইল।

"করো না? কেন করো না? পৈতেটা তা হলে গলায় রাখার অর্থ কী?"

পলাশ বলল, "আগে করতুম, হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেছে।"

"আজ থেকে আবার শুরু করো। তর্পণে, আহ্নিকে মনের জোর বাড়ে বোকা ছেলে। সব ছেড়ে, কেবল ওইটাকে ধরে রেখো।"

ডক্টর প্রশান্ত বোসের দিদির নাম রমা। রমা বোস। নিমেষে সারা বাড়িটা নিজের দখলে নিয়ে এলেন। প্লাস্টিকের বাস্কেট থেকে বাজার বেরোল। আলু, পটল, উচ্ছে, ঝিঙে, পোস্ত, তেলের টিন, মশলা। সব জোগাড় করে এনেছেন। পলকে

ঘরদোর সাফসুতরো করে চেহারা ফিরিয়ে দিলেন। গুনগুন গান, আর কাজ একই সঙ্গে চলেছে। একটু আগে পলাশের মনে হচ্ছিল, চারপাশ থেকে যেন অন্ধকার ঘিরে আসছে। এখন মনে হচ্ছে, একঝলক আলো এসে পড়েছে। দুঃখ-দুঃখ ভাবটা চলে গেছে।

পলাশের একটাই কেবল লজ্জা, দিদির সামনে তাকে অতি কষ্টে, ধরে ধরে হাঁটতে হচ্ছে। কেবলই মনে হচ্ছে খোঁড়া বলে যদি ঘৃণা করেন। রমা বুঝতে পেরে বললেন, কয়েক দিন কষ্ট করো, তারপর তোমার পায়ের একটা এসপার-ওসপার করা হবে। কিছু না পারা যায় তো, একটা লোহার ঠ্যাং পরিয়ে দেওয়া হবে। পা নিয়ে অত ভাবিসনি পাগলা ছেলে। কবি বায়রন খোঁড়া ছিলেন। অত বড় বীর তৈমুর লং খোঁড়া ছিলেন। জানিস তো, ভগবানের ভারী মজার নিয়ম, একটা নিলে আর একটা কিছু দিয়ে পুষিয়ে দেন। তোর প্রতিভা বেড়ে যাবে, দেখবি। তোর মুখ দেখে মনে হচ্ছে, বিরাট লেখক হবি। মাস্টারমশাই ওপর থেকে দেখবেন আর আশীর্বাদ করবেন।"

"বাবা, আপনাকেও পড়াতেন?"

"ভাই-বোন দু'জনেই ওঁর কাছে পড়েছি। তোর দুর্ভাগ্য, অমন একজন শিক্ষকের কাছে তুই পড়তে পেলি না। তুই আমার কাছে পড়বি। কিল, চড়, গাঁট্টা খাবি। কাল থেকে ইস্কুল শুরু। আর না। অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেছে।"

"মা, মায়ের কী হবে?"

"সে ভাবনা তোমার নয় প্রভু। তুমি এখন থেকে নিজের ভাবনা ভাবো।"

পিওন একটা চিঠি দিয়ে গেল। সাদা লম্বা খাম। খুলবে কি খুলবে না, ভাবছে। কে জানে কী আছে ভেতরে। আজকাল সবেতেই ভীষণ ভয় করে। রমা বললেন, "খোলো, খুলে দ্যাখো।"

"আমার ভয় করছে দিদি। আপনি খুলুন।"

"আচ্ছা পলাশ, একটা চিঠিতে কী ভয় থাকতে পারে! তোমার মাথাটা একেবারে গেছে। দে, আমার হাতে দে।"

রমা সাবধানে চিঠিটা খুললেন। খড়খড়ে দামি কাগজে টাইপ-করা চিঠি। চিঠিটা পড়েই পলাশকে জড়িয়ে ধরলেন, "তুই এক কাণ্ড করে বসে আছিস। অ্যাঁ, এ কী কাণ্ড!"

পলাশ কিছুই বুঝতে পারছে না, কী কাণ্ড সে করতে পারে। রমাদি তাকে এমন ভাবে জড়িয়ে ধরেছেন, ভালভাবে নিশ্বাস নিতে পারছে না। পলাশের অল্প অল্প চুল বেরোনো খড়খড়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন আর বলছেন, "তুই একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড করেছিস পাগলা।"

রমার বুকে পলাশের মুখ গোঁজা, সেই অবস্থায় পলাশ বললে, "কী করেছি গো দিদি, বলো না।"

"আগে কী খাওয়াবি বল?"

"তুমি যা খেতে চাইবে।"

"আপাতত তোর গালে একটা চুমু খাই।"

পলাশকে ছেড়ে দিয়ে চিঠিটা কোলের ওপর মেলে ধরলেন, "তুই কোনও এক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় প্রবন্ধ পাঠিয়েছিলিস?"

"হ্যাঁ, দিদি। ইংরিজি প্রবন্ধ, ম্যান আই লাভ। আমি মানুষ ভালবাসি।"

"তোর প্রবন্ধ বিচারে প্রথম হয়েছে। তেরো হাজারে তুই প্রথম। তোকে আমি বলিনি, তুই লেখক হবি।"

"তা প্রথম হলে, আমার কী হবে!"

"তোকে সব খরচখরচা দিয়ে ওরা আমেরিকা ঘোরাবে। পাঁচ হাজার ডলার মানে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার দেবে।"

পলাশ কেঁদে ফেলল।

"কাঁদছিস কেন?"

পলাশ অতি কষ্টে বলল, "বাবা।"

"তুই কি মনে করছিস, মাস্টারমশাই নেই! তিনি জানতে পারছেন না। সব দেখছেন, সব শুনছেন তিনি। তিনি এখন আকাশের চোখে দেখছেন, বাতাসের তরঙ্গে শুনছেন। গাধা একটা। যা বাবার ছবিকে প্রণাম করে আয়।"

"তার আগে তোমাকে।"

"তুই ব্রাহ্মণ।"

"তুমি দিদি।"

"বেশ, আগে বাবাকে প্রণাম করে আয়।"

পলাশ বাবার ছবির সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। বাবা হাসছেন, আর ফিসফিস করে যেন বলছেন, 'পলাশ বড় হও, বড় হও, তুমি এগিয়ে চলো।' মা দেওয়াল থেকে ছবিটা পেড়েছিলেন। পলাশ চেয়ারে বসিয়েছে, ঠিক যেভাবে তিনি পড়বার বা পড়াবার সময় বসতেন। পলাশের কেবল মনে হতে লাগল, মা'কে সে এমন একটা খবর শোনাতে পারল না। কোনও দিন আর শোনাতে পারবে কি!

বিকেলের দিকে বাড়ির সামনে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। নেমে এলেন ডাঃ প্রশান্ত বোস। হাতে একটা বড়সড় ব্যাগ। রাতের রুগি দেখা শুরু হবার আগে ঘণ্টাখানেকের ছুটি মিলেছে। ছুটে এসেছেন খবর নিতে। ঢুকেই বললেন, "সব ঠিক আছে?"

দিদি বললেন, "ঘুমোচ্ছেন, তোর ওষুধের ঘোরে। এক সময় ঘোর কেটে যাবে, তখন বোঝা যাবে ঠিক-বেঠিক।"

"তা অবশ্য ঠিক।"

প্রশান্ত বোস শোভনার নাড়ী দেখতে লাগলেন হাতঘড়ির ওপর চোখ রেখে। এক সময় হাতটাকে বিছানার ওপর ধীরে-ধীরে নামিয়ে রেখে পলাশকে প্রশ্ন করলেন, "খাওয়াদাওয়া একেবারে ছেড়ে দিয়েছিলেন, তাই না!"

পলাশ বললে, "অনেকটা সেইরকমই। দুপুরে বসতেন আর উঠতেন। রাতে কিছুই খেতেন না।"

ঘরের বাইরে এসে, দালানের চেয়ারে বসতে বসতে রমাকে প্রশ্ন করলেন, "দিদি, কী করা যায় বল তো!"

"বেশ কিছু দিন ওঁকে এইভাবে ঘুম পাড়িয়ে রাখ। ভেতরটা একেবারে ওলটপালট হয়ে গেছে, একেবারে তছনছ অবস্থা। সময় হল সবচেয়ে বড় ডাক্তার। তোরাই তো বলিস!"

"ওঁকে খুব খাওয়াতে হবে, বুঝলি। নাড়ী একেবারে ক্ষীণ। প্রেশার মাপলেই দেখা যাবে ভীষণ লো। পুরো ব্যাপারটা নিয়ে বেশ ভাবার আছে।"

"তোকে একটা সুসংবাদ শোনাই। পলাশ আন্তর্জাতিক রচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে। একটু আগে চিঠি এসেছে। পুরস্কার, পাঁচ হাজার ডলার ক্যাশ আর আমেরিকা ভ্রমণ।"

"সত্যি! উঃ মাস্টারমশাই থাকলে কী খুশি হতেন! চিয়ারআপ পলাশ! ছেলেটা এত ভাল। এই বয়েসের অন্য ছেলেদের দেখি তো, পেকে একেবারে ঝানু। তুই দেখবি দিদি, এই ছেলেটা কালে বিরাট হবে। আমার এখন প্রথম লড়াই হল, ওর পা'টাকে যেভাবেই হোক মেরামত করে দিতে হবে। ডাক্তারিশাস্ত্রের এত উন্নতি হল, আর একটা পা ঠিক করা যাবে না!"

"ও তো আমেরিকা যাবে। সেখানে একটা কিছু করা যাবে না! তোর তো অনেক চেনাশোনা আছে!"

"সুযোগ যেচে এগিয়ে এসেছে, দেখা যাক কী করা যায়। তুই চা কর দিদি। আর ওই ব্যাগের জিনিসগুলো সব বের করে সাজিয়ে রাখ।"

ব্যাগের ভেতর থেকে একে একে অনেক জিনিস বেরিয়ে এল। চায়ের প্যাকেট। বিস্কুট। শুকনো ফল। চানাচুর। মিষ্টি। ওষুধ, গ্লুকোজ।

প্রশান্ত বোস বললেন, "পলাশ, ঘুরবে ফিরবে আর এই সব খাবে। শুধু খেয়ে যাও। বয়েসের তুলনায় তোমার ওজন কম। শরীরে স্ট্রেংথ চাই, নইলে তোমার পা মেরামত করা যাবে না। বুঝলে বাবু?"

চা শেষ করে, প্রশান্ত বোস বললেন, "অনেক কিছু ভাবার আছে। মায়ের সেবা, চিকিৎসা, পলাশের পা, বিদেশ যাওয়া। মাস্টারমশাইয়ের দেনাপাওয়া আদায়। সংসার চালাবার পাকাপাকি ব্যবস্থা। আজ রাতে সব হবে। আমি দ্বিতীয় রাউন্ড সেরে আসি।"

"রাতে ও-বাড়ির কী হবে?"

"চাবি দিয়ে আসব। নীচে আমার কম্পাউন্ডার থাকবে।"

ডক্টার বোস পলাশের মাথাটা নেড়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। রমাদি বললেন, "পলাশ কাছাকাছি তোমার বন্ধুবান্ধব কেউ নেই?"

"ছিল, কেউ আর তেমন আসে না। জানেই তো আমার ভাঙা পা, বেরোতে পারব না।"

"হ্যাঁ, আজকাল তো আর কোনও পাড়াতেই খেলার মাঠ নেই। পার্কও সব গেছে। রাস্তায়-রাস্তায়, ঘুরে বেড়ানো ছাড়া আর তো কিছু করা যাবে না।"

"আপনি এখন কী করবেন দিদি?"

"আমি এখন রান্না করব। তার আগে চান করব। তারপর পুজো করব। ফুড তৈরি করে মা'কে কোনওরকমে তুলে খাওয়াব। তারপর আবার ঘুম পাড়াব। প্রশান্ত আসবে, তখন ঠিক হবে মায়ের চিকিৎসা। তারপর তোর সঙ্গে গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ব। সাতটা দিন আমরা এই ভাবে চালাতে পারব। তারপর কী হবে রে পলাশ!"

"কেন দিদি?"

"তারপর যে আমাকে চলে যেতে হবে।"

"কোথায় দিদি?"

"আমার জায়গায় এলাহাবাদে। জানিস পলাশ, জায়গাটা ভারী সুন্দর! তুই আমেরিকা থেকে ঘুরে আয়, তোকে আমি নিয়ে যাব।"

"ওখানে আপনার কী আছে দিদি?"

"আমার শ্বশুরবাড়ির দেশ রে। তোর জামাইবাবু বিমান-দুর্ঘটনায় মারা গেলেন?"

"মারা গেলেন।"

"হ্যাঁ রে, আমাকে ছেড়ে চলে গেল। বুঝলি, বিরাট বড় বিজ্ঞানী ছিল। আণবিক বিজ্ঞানে এক নম্বর। নিউক্লিয়ার সায়েন্টিস্ট। বিদেশ থেকে কনফারেন্স করে জাপান এয়ার লাইনসের প্লেনে ফিরছিল। হয়ে গেল সব শেষ। খেলা না ফুরাতে খেলাঘর ভেঙে যায় রে। তবে আমি ভাঙিনি পলাশ। অনেক টাকা পেয়েছিলুম। ছিলও বেশ কিছু। গঙ্গার ধারে বিশাল একটা বাড়ি ছিল। প্রচুর জমি। জীবনে এক মহাপুরুষ এলেন। বললেন, দুঃখটাকে সেবা দিয়ে চেপে রাখো। লাগিয়ে দাও বিশাল এক কর্মযজ্ঞ। আমার স্বামীর নামে সেখানে বিশাল এক ফাউন্ডেশান তৈরি হয়েছে। শিশুদের চিকিৎসা। দুস্থদের সেবা। প্রতিবন্ধীদের জন্যে শিক্ষাকেন্দ্র। উৎপাদন কেন্দ্র। বেশ ভালই হচ্ছে রে পলাশ। কাজ করার, নিজেকে ছড়িয়ে দেবার বেশ বড় একটা জায়গা পাওয়া গেছে। তুই যাবি সেখানে?"

"দিদি, ওরা কি সত্যিই আমাকে পাঁচ হাজার ডলার দেবে?"

"কেন দেবে না? অত বড় দেশ, মিথ্যে কেন বলবে পলাশ!"

"কবে দেবে?"

"দ্যাখ না, মাসখানেকের মধ্যেই এসে যাবে।"

"দিদি ওই টাকাটা আপনি নেবেন। নিয়ে কী করবেন, আমার বাবার নামে একটা কিছু করবেন। এমন একটা কিছু যাতে আমার মায়েদের মতো মায়েরা আবার হাসতে পারেন। আপনার মতো বড় কোনও কাজে লাগতে পারেন। করা যায় না দিদি! আমার মা হয়তো দিনকতক বাদে রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়াবেন আর ছেলেরা 'পাগলি, পাগলি' বলে ঢিল ছুঁড়বে। আমার কী মনে হয় দিদি, আমার মা'কে যদি বেশ করে একবার নাড়িয়ে দেওয়া যায়, বাবার গলায় কেউ যদি মা'কে বারবার ডেকে বলেন, 'শোভনা, এ কী হচ্ছে! আমি কি তোমাকে বলেছিলুম, হারিয়ে যাও, এই ভাবে হেরে যাও। যাও ওঠো। কত কী করার আছে। শিগগির ওঠো। শিগগির ওঠো। আমি বলছি ওঠো।'"

পলাশের গলা ধরে এল। ওঠো, ওঠো বলতে বলতে, সে কেঁদে ফেলল আবেগে। রমাদি এগিয়ে এলেন। তাঁর মনে হল, পলাশ একেবারেই সাধারণ ছেলে নয়। ছেলেটার মধ্যে অসীম

সম্ভাবনা রয়েছে। একে ছাড়লে চলবে না। বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, "পলাশ, তোর যদি সেইরকম ইচ্ছেই হয়ে থাকে, আমি ব্যবস্থা করব। তবে জেনে রাখ, তোকে আর মা'কে আমরা বুক দিয়ে আগলাব। পলাশ, তুই অদ্ভুত একটা ধারণা মাথায় খেলিয়ে দিলি, প্রশান্ত আসুক আলোচনা করব।"

"কী আইডিয়া দিদি!"

"প্রশান্ত আসুক। আর আমার সময় নেই। সন্ধে নামছে রে পলাশ।"

দিন এবার ঘুমিয়ে পড়বে। চোখ প্রায় বুজে এসেছে। এই সময়টা পলাশের সবচেয়ে খারাপ লাগে। চারপাশ নিঝুম হয়ে আসছে। আকাশের পথ শূন্য। কোনও পাখি নেই। পাখার ছটফটানি নেই। টিপটিপ আলো জ্বলে উঠছে চারপাশে। বিমানদাদুর সেই ডায়েরিটা পলাশ খুলে বসল। কোথায় চলে গেল মানুষটা। কারখানাটা ভাইরা পুড়িয়ে দিয়েছে। ঘাড়ধাক্কা দিয়ে অত বড় মানুষটাকে বের করে দিল। মাঝে-মাঝে ইচ্ছে করে অরণ্যদেব হয়ে এইসব মানুষ, যারা চারদিকে অন্যায় করে বেড়াচ্ছে, তাদের শেষ করে দিতে। ওই যে কালা, ওকে একদিন না একদিন, কাউকে না কাউকে শিক্ষা তো দিতেই হবে।

পলাশের এক বগলে বিমানদাদুর ডায়েরি, আস্তে-আস্তে মায়ের ঘরে গিয়ে ঢুকল। পাশ ফিরে কুঁকড়েমুকড়ে শুয়ে আছেন মা। একেবারে বেহুঁশ। ফর্সা কপালে এলোমেলো চুল। টুক্‌টুকে পায়ের গোড়ালি কেমন যেন ক্ষয়ে ক্ষয়ে এসেছে। অসহায় মা শুয়ে আছেন। অন্ধকার হয়ে এসেছে। দু'চারটে মশা পিন্‌পিন্‌ করছে। পলাশ খাটের চারপাশে ঘুরে-ঘুরে মশারিটা ফেলে দিল। এক পায়ে নেচে-নেচে ঘুরে বেড়াতে ভয় করে। থপথপ করে এমন শব্দ হয়। ঘুমন্ত মানুষের ঘুম না ছুটে যায়। পলাশ ছোট আলোটা জ্বেলে দিল।

দালানে বসে, বিমানদাদুর ডায়েরিটা খুলল।

"যখন যা করি, যে কাজই করি, সব সময় মনে হয়, সেই মহাপুরুষ বহু দূর থেকে যেন ডাকছেন আমাকে। কেন বাজে কাজে সময় নষ্ট করছিস! আয় চলে আয়, আমার কাছে। তিন দিনের জ্বরে বাবা চলে গেলেন। বিশাল ব্যবসা, বিশাল সম্পত্তি, গাড়ি-বাড়ি, সব তছনছ হয়ে পড়ে রইল। আমার বয়েস তখন ষোলো পেরিয়েছে। আমার কাকা আর অন্যান্য আত্মীয়স্বজন একেবারে শকুনির মতো খেয়োখেয়ি শুরু করে দিলেন। বিষয় বিষয় করে সব পাগল হয়ে গেল। মাকে বিষ খাইয়ে মারার চেষ্টা হল। আমি তখন রাস্তায় রাস্তায় কুকুরের মতো ঘুরছি। একদিন নিমতলার শ্মশানে দেখি মৌন মিছিল করে এক মহাপুরুষের মৃতদেহ নিয়ে এল। ফুলে ফুলে ঢাকা। ধূপ আর আতরের গন্ধে চারপাশ ভরে গেছে। উঁকি মেরে দেখি আমার সেই সাধুবাবা। কবে এই শহরে এলেন, কবে দেহ রাখলেন। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। জানতে পারলুম না, যাওয়া হল না, দেখা হল না, কত কী জানার ছিল, উপদেশ নেবার ছিল। আমার এত দুঃসময় আর তিনি চলে গেলেন। চিতা জ্বলে উঠল। আগুন লাফিয়ে উঠল আকাশে। চন্দনকাঠের অপূর্ব গন্ধ। আগুনের বিছানায় যেন সোনার দেহ শুয়ে আছে! একপাশে চুপ করে বসে আছি। ঘন্টার পর ঘন্টা কোথা দিয়ে কেটে গেল। রাত প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। গঙ্গার ঘাটে গেলুম। পশ্চিম আকাশে পুব আকাশের আলোর ছোঁয়া লেগেছে। সেই ঝাপসা আলোয় দেখি জলের কিনারায় দাঁড়িয়ে সাদা একটি মূর্তি হাতছানি দিয়ে আমাকে ডাকছে। সাহস করে এগিয়ে গেলুম। কাছে গিয়ে ভয়ে হাত-পা হিম হয়ে গেল। এ

কী, এই যে আমার সাধুবাবা। তা কী করে হয়! তিনি তো পুড়ে ছাই হচ্ছেন। সব শেষ হয়ে এসেছে। চিতায় এইবার জল ঢালা হবে। আমি কোনওরকমে বললুম, সাধুবাবা। তিনি স্পষ্ট বললেন, আমি চলে যাচ্ছি। ভাবিসনি, আমার শক্তি রইল। শক্তি দিয়ে সব ঠাণ্ডা করে দে। ধীরে-ধীরে তিনি জলে নেমে গেলেন। আমি স্পষ্ট দেখলুম, একটা সোনালি আলো ঝিকমিক করতে করতে জলের অতলে চলে গেল। আমি হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছি। আমার চারপাশ দিয়ে, যাঁরা তাকে নিয়ে এসেছিলেন, তাঁরা শুভ্র বসন পরে সার বেঁধে জলের দিকে নেমে যাচ্ছেন। চিতাভস্ম বিসর্জন দেবার জন্যে।

"আমি তখন সিমুলিয়া ব্যায়াম সমিতিতে রোজ শরীরচর্চা করি। কুস্তি শিখি গোবরবাবুর আখড়ায়। দশ-বারোটি ছেলে জোগাড় করে ফেললুম। পশুশক্তিকে শক্তি দিয়েই জব্দ করব। আমার সেই আত্মীয়স্বজনের দল, তাদের বেধড়ক পিটিয়ে দিলুম। কেউ মরল না, তবে বিছানায় পড়ে রইল সব এক মাস ধরে। পুলিশ কেস হল। কলকাতার মাথাঅলা লোকেরা আমার সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এলেন। আমি আবার এক রাউন্ড পিটিয়ে দিলুম। আমি তখন খেপে গেছি। এমন ব্যবস্থা করলুম, বাড়ি থেকে বেরোলেই পেটাই। বেধড়ক মার। দেহ আর মন দুটোরই শক্তি তখন এত বেড়ে গিয়েছিল যে, নিজেই অবাক হয়ে যেতুম। একবারও মনে হত না যে, আমি কোনও অন্যায় করছি। বরং মনে হত, আমি কুরুক্ষেত্রের অর্জুন। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, ধর্মযুদ্ধে কৌরব-পক্ষকে শেষ করে দাও। পাপে ওরা এমনিই শেষ হয়ে আছে, তুমি নিমিত্ত মাত্র। এক মাসের মধ্যে আমার সেই লোভী, অনাচারী, দুর্দান্ত

আত্মীয়স্বজনেরা সব ঢিট হয়ে গেল।"

পলাশের মা হঠাৎ বিছানায় উঠে বসলেন। দু' হাত বাড়িয়ে এপাশে ওপাশে কাকে যেন খুঁজলেন। পলাশ ডায়েরি ফেলে ছুটে এল, "মা, তুমি কী খুঁজছ !"

শোভনা জড়ানো গলায় বললেন, "গাছটা কোথায় গেল ! অত বড় গাছ।"

আর ঠিক সেই সময় রমাদি ঢুকলেন, হাতে গেলাস। শোভনাকে খাওয়াবেন।

"মা।"

শোভনা আশ্চর্য শান্ত গলায় বললেন, "তুই এসেছিস মা। কবে এলি ! ওরা সব ভাল আছে তো !"

"হ্যাঁ মা, সবাই ভাল আছে। আপনি এইটা খেয়ে নিন।"

"কী এনেছিস আমার জন্যে, ডাবের জল !"

"হ্যাঁ, মা।"

"মিত্তিরদের পুকুরপাড়ের সেই ডাবগাছগুলো এখনও ঠিক আছে, না রে মেয়ে !"

"হ্যাঁ, মা।"

"বাজ পড়েনি ?"

"কই না তো !"

গেলাসে চুমুক দিয়ে বললেন, "কী মিষ্টি জল দেখেছিস ! একটা ডাবে দু' গেলাস জল। আমাকে নারকোলটা দিস। বড় মিষ্টি শাঁস। দুরমো, দুরমো। মৃগেনের মা'কে বল, কেটে দেবে। ও পারে। তুই চেষ্টা করিসনি। ধারালো কাটারি। হাত কেটে ফেলবি। তোর শ্বশুর আমাকে বকবে।"

পলাশ বুঝতেই পারল, মা তাঁর দেশের বাড়ির কথা বলছেন। মিত্তিরদের দিঘি, ডাবগাছ, মৃগেন, মৃগেনের মা। সব সেই ছেলেবেলার কথা। পলাশের আগে, পলাশের এক দিদি হয়েছিল। তিন বছর থেকে চলে গিয়েছিল। রমাদিকে, মনে হয়, তাঁর সেই মেয়ে ভেবেছেন।

মা হঠাৎ মশারি থেকে বেরোবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

"কোথায় যাবেন মা আমাকে বলুন।"

"আমি প্ল্যাটফর্মে একটু ঘুরি না রে। ট্রেন আসতে তো অনেক দেরি। দুটো চল্লিশের আগে তো আসবে না। এই এক লাইন বাবা ! সব সময় লেট। স্টেশানমাস্টারকে জিজ্ঞেস করে এসো না, ক' ঘণ্টা লেট। তোর বাবাকে বল্ না, আমার জন্যে একটা পান আনবে, মিষ্টি পান।"

রমাদি মশারির একটা পাশ তুলে ধরে বললেন, "আসুন, নেমে আসুন।"

শোভনা অবাক হয়ে বললেন, "নামব কেন। তোরা আমাকে নামাতে চাইছিস কেন ! হ্যাঁ রে, আমি কী করেছি ! কেন তোরা আমাকে মারছিস ! আমি আর করব না। মা, আর মেরো না মা, আমি আর করব না মা।"

শোভনা ফুলে-ফুলে কাঁদতে লাগলেন। রমাদি বিছানায় ঢুকে মা'কে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

শোভনা কান্না-মেশানো গলায় বলছেন, "হাসি আমাকে বললে, কলকাতার দল, ভাল পালা, তাই তো আমি গেলুম। আমার কী দোষ ! ও বললে কেন ? আমার কী দোষ ! আমি কি একলা গেছি।"

রমাদি চাপাগলায় পলাশকে বললেন, "ঠাণ্ডা জলে একটা তোয়ালে ভিজিয়ে আনবি ?"

মা তখন বলছেন, "নেড়া বোষ্টুমির কথা তুমি বিশ্বাস কোরো না। ও পয়সার লোভে ভীষণ মিথ্যে বলে। ওর একতারার খোলে সাপ আছে মা। আমরা দেখেছি।"

তোয়ালে ভেজাতে ভেজাতে পলাশের মনে হল, আমি লিখতে পারি। এখনই একটা উপন্যাস লিখতে পারি ইংরেজিতে। বাবা আমাকে ইংরেজিতে চোস্ত করে দিয়ে গেছেন। যাঁরা আমাকে প্রবন্ধের জন্যে প্রথম পুরস্কার দিয়েছেন, তাঁদের কাছে পাঠালে, ছেপে বই করে দিতে পারেন না ?

৯

"তুমি যদি অনুমতি দাও, তা হলে আমি একটা সিগারেট ধরাই।"

প্রশান্তদার কথায় পলাশ অবাক হল। বললে, "আপনি আমার দাদা। আর আপনি আমার অনুমতি চাইছেন !"

"চাইব না ! সিগারেট খাওয়া যে অপরাধ। কী করব বলো, লণ্ডনে যা শীত, সেই শীত তাড়াতে সিগারেটের বদ অভ্যাস। তবে বেশি খাই না, দিনে তিনটে কি চারটে।"

রাতের খাওয়া শেষ। দালানে মাদুর বিছিয়ে তিনজনে বসেছে। অনেক দিন পরে পলাশ আজ খুব ভাল খেয়েছে। রমাদির হাতের রান্না অবিস্মরণীয়। প্রশান্তদা বেশ আরাম করে একপাশে হেলে বসেছেন। পলাশের আজ ভারী ভাল লাগছে। এমন দাদা, এমন দিদি ক'জনের ভাগ্যে জোটে। সবসময় হাসি মুখ। দুঃখ-কষ্টের কথা নেই। সবসময় ভাল-ভাল আলোচনা।

প্রশান্তদা বললেন, "তোর পরিকল্পনাটা বল দিদি।"

"আজকের দিনটা তো চলে গেল, আমি আর সাত দিন আছি। এর মধ্যে সব ব্যবস্থা করে, আমি মা'কে আর পলাশকে নিয়ে এলাহাবাদ চলে যাব।"

"পলাশের লেখাপড়া ?"

"ওখানে আমি ব্যবস্থা করব। কোনও অসুবিধে হবে না। ইংলিশ মিডিয়াম সর্বত্র আছে।"

"বেশ, মায়ের চিকিৎসা ?"

"চিকিৎসা তো একটাই। ঘুম, ভাল খাওয়া, মনের আনন্দে থাকা। কোনওটারই অভাব হবে না।"

"বেশ, এই বাড়ি ?"

"ছেড়ে দাও। কী হবে শুধু শুধু ভাড়া গুনে !"

"ছাড়ার আগে একটা কথা ভাবতে হবে, পরে এই ভাড়ায় এমন বাড়ি কিন্তু আর মিলবে না।"

"না মিলুক, কলকাতায় আমাদের বাড়ি তো আছে।"

"বেশ, তোর সিদ্ধান্তই পাকা। এইবার পলাশের আমেরিকায় যাওয়া, পলাশের পা মেরামত।"

"হ্যাঁ, ওই দুটো ভাবতে হবে। আমেরিকায় ভাল কোনও অরথোপেডিক সার্জেনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।"

"ডালাসে ডক্টর ডেভিস হলেন এক নম্বর। তাঁর সঙ্গে আমি ফোনে কাল যোগাযোগ করব। ভালই আলাপ আছে।"

পলাশ এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিল, এইবার বললে, "আমি আমেরিকা যাব না।"

প্রশান্তদা বললেন, "সে কী। কেন যাবে না, এমন একটা সুযোগ ! রথ দেখা কলা বেচা দুটোই হয়ে যাবে।"

"ওদেশে শুধু বেড়াতে গিয়ে কী হবে ! আমি তো আর লেখাপড়া করতে যাচ্ছি না। আর এই পা নিয়ে আমি তো তেমন বেড়াতেও পারব না। যাঁরা নিয়ে যাবেন, তাঁরাও বিরক্ত হবেন। দাদা, আপনি বরং ওঁদের কাছে লেখালিখি করে, বেড়াবার জন্যে যে খরচটা হত, সেটা আমার দিদির

ফাউণ্ডেশানকে দিতে বলুন, তাতে আমার মতো যারা পঙ্গু তাদের অনেক উপকার হবে।"

"আমেরিকা গেলে তোমার পায়ের অপারেশানটা আর একবার করানো যেত!"

"সে না হয় এই দেশেই হবে। এ-দেশে আপনি আছেন, আরও বড়-বড় সব ডাক্তার আছেন, যা হবার তা এখানেই হবে। বিদেশে যাবার ইচ্ছে আমার একদম নেই, আমি যাবও না। ফিরে এসে, এই দেখলুম, ওই দেখলুম, বড়-বড় গল্প আর এক বছরের মধ্যে সব ভুলে যাওয়া। আমি আগে আপনার মতো ডাক্তার হব, তারপর বিদেশ যাব।"

প্রশান্তদা রমাদিকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুই কী বলিস দিদি!"

"ভালই বলেছে। একা-একা ছেলেটাকে ছেড়ে দিতে আমারও ইচ্ছে করছে না। বড় হলে ও নিজেই কতবার কত দেশে যেতে পারবে, আর সে যাওয়া হবে কাজের।"

"ওকে তুই ভিতু করে দিচ্ছিস!"

"মোটেই না। ভিতু করব কেন। দেশে-দেশে ঘুরলেই কি আর সাহসী হয়! তুই ওদের লেখ। কালই লেখ। দেখ না কী বলে!"

"আর ওর পা! ডক্টর ডেভিসকে তা হলে লিখব না? ফোন করব না!"

"রাজস্থানে ডক্টর আগরওয়াল এই দেশে এই সব ব্যাপারে এক নম্বর। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ কর। আমারও আলাপ আছে।"

"হ্যাঁ ঠিক বলেছিস। আমরা আগেই সাদা চামড়ার দিকে হেলে পড়ি, দুশো বছরের পরাধীনতার ফল। ডক্টর আগরওয়াল কিছু কম যান না। বেশ, এই তা হলে আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। কেমন? কী বলো পলাশ?"

"হ্যাঁ দাদা। এ বাড়িতে আমার আর ভাল লাগছে না।"

"তা হলে আজ আমরা 'দুর্গা' বলে নিদ্রা যাই।"

"নিদ্রা যাবার আগে আর একটা কথা, মায়ের চিকিৎসার কথা। আমার মনে হচ্ছে, যে-ভাবেই হোক মায়ের স্মৃতি থেকে বর্তমান মুছে গেছে। মা এখন অতীতে বেঁচে উঠেছেন। যা বলছেন, তা সবই অতীতের কোনও না কোনও ঘটনা। অতীতের সব চরিত্রের সঙ্গে কথা বলে চলেছেন। পলাশ একটা ভাল কথা বলেছে, কেউ যদি মাস্টারমশাইয়ের গলায় মা'কে আদেশ উপদেশ দিতে পারত, তা হলে মা মনে হয় আবার বর্তমানে ফিরে আসতে পারেন।"

"ভালই বলেছে, পরীক্ষাও হয়তো করা যেত, কিন্তু মাস্টারমশাইয়ের গলায় কে কথা বলবে! অনেক সময় ছেলের গলা বাবার মতো হয়; কিন্তু পলাশ তো এখন কিশোর। মা'কে এখন ওই ঘুম পাড়িয়ে-পাড়িয়েই ঠিক করতে হবে। অন্য আর কোনও রাস্তা নেই। ইলেকট্রিক শক বড় নিষ্ঠুর চিকিৎসা।"

পলাশ বললে, "না না, ওসব দরকার নেই।"

"তুমি বলবে কী, আমি নিজেই ও রাস্তায় যেতে চাই না।"

পলাশ রমাদির পাশে একই বিছানায় শুয়ে আকাশপাতাল ভাবতে লাগলেন। রমাদি শুয়েই ঘুমিয়ে পড়লেন। পলাশের ঘুম আর আসে না। রোজই শোবার সময় মনে করে, বাবা আজ স্বপ্ন দেবেন। কোথায় কী! আবোলতাবোল স্বপ্নে রাত ঘুরে দিনে চলে যায়। আজ পলাশ এলাহাবাদের কথা ভাবছে, যেখানে প্রয়াগ। কখনও যায়নি, তবু যেন দেখতে পাচ্ছে, গঙ্গার ধার, বিশাল এক বটগাছ, সাধুদের ডেরা, মন্দির, নতুন-নতুন, হাসি-হাসি মুখ, টাঙ্গা ছুটছে। ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে শুনতে পলাশ শেষে ঘুমিয়ে পড়ল।

সাত সকালেই ভীষণ চেঁচামেচি, শোরগোল। বাড়িঅলা ভানুবাবু একেবারে মারমুখী। প্রশান্তদা চা খাচ্ছিলেন। পলাশকে জিজ্ঞেস করলেন, "অসভ্যটা কে?"

"আমাদের বাড়িঅলা!"

"কী চায়! যাব নাকি? গিয়ে মারব দুই থাপ্পড়।"

"আমি দেখছি।"

পলাশ এগিয়ে গেল। পলাশকে দেখে ভানু বললে, "কী, ব্যাপার কী, তোমরা উঠবে না?"

পলাশ জোর গলায় বললে, "না।"

"তার মানে? আমি বাড়ি বিক্রি করব।"

"আপনি যা খুশি করুন, আমরা উঠছি না।"

"ভাল কথায় যখন হচ্ছে না, তখন আমাকে অন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।"

"নিন না, কে বারণ করছে!"

"সে-ব্যবস্থা তোমার পক্ষে খুব সুখের হবে না!"

"আমার পক্ষে সুখের না হোক, আপনার পক্ষে খুব দুঃখের হবে।"

প্রশান্তদা আর রমাদি দু'জনেই এইবার বেরিয়ে এলেন। ভানু একটু ভড়কে গেল। প্রশান্তদাকে রাজার মতো দেখতে। রমাদি যেন অন্নপূর্ণা।

ভানু বললে, "আপনারা?"

প্রশান্তদা বললেন, "কী ব্যাপার! কাল বিকেলেই তো আপনি আমার হাসপাতালে, আমার ঘরে খুব কান্নাকাটি করছিলেন, আর আজ সাতসকালেই আমার বাড়িতে এসে আমার ভাইকে খুব হম্বিতম্বি করছেন? আপনি তো অদ্ভুত জানোয়ার! জানেন, আপনার মেয়ের জীবন আমার হাতে। জাপান থেকে বিশেষ ব্যবস্থায় ওই ইনজেকশান না আনাতে পারলে, আয়ু মাত্র এক মাস।"

ভানুর চোখ বড়-বড়। মুখ-চুন। আমতা-আমতা করে বললে, "ডাক্তারবাবু, আপনি! আপনি আমার ভাড়াটে! আমি ঠিক…।"

"চিনতে পারেননি! ব্যবসাদার, মাস্তান, দরকার ছাড়া মানুষকে চিনবেন কেন? আপনাকে আমি কিন্তু ভীষণ বিপদে ফেলে দিতে পারি। ভোলাকে চেনেন?"

"কে ভোলা?"

"কে ভোলা? চেনেন না, না! তা হলে থানাতে বিমলের চেম্বারেই চেনাচেনি হবে কেমন? ভোলা আপনাকে সহজে ছাড়বে না। মাস্টারমশাইকে সে ভীষণ শ্রদ্ধা করত, এখনও করে। ডাকাতি করার সাজা জানেন? ক'বছর ঘানি ঘোরাতে হয়? আপনার বড় মেয়ের শ্বশুরমশাইকে বলব নাকি?"

ভানুর মুখ দেখে পলাশের মনে হল, এক্ষুনি কেঁদে ফেলবে।

প্রশান্তদা বললেন, "মনে আছে, আপনার মেয়ের জন্যে আপনার রক্ত পরীক্ষা করেছিলুম, আপনার রক্তে কী পেয়েছি জানেন?"

ভানু ভালমানুষের মতো মাথা নাড়ল, জানে না।

"আপনার অবস্থা খুব খারাপ। যেভাবে জীবন চালাচ্ছেন, এই ভাবে চালালে বেশি দিন খাড়া থাকতে পারবেন না। শুয়ে পড়তে হবে, আর শেষটা হবে বড় দুঃখের।"

ভানু কাঁদো-কাঁদো ভাবে বললে, "আমি মরি ক্ষতি নেই,

বিজ্ঞাপন
info@aimraj.com
যেখানেই বাংলার সুর সেখানেই
www.aimraj.com

মেয়েটাকে বড় ভালবাসি। ওকে আপনি ভাল করে দিন।"

"কেন, আপনি তো গুণ্ডা পোষেন, আপনার তো খুব জোর, গায়ের জোরে ভাল করা যাবে না! এই ছেলেটির বয়েস কত? আপনার মেয়ের বয়সী। তার ওপর এত হম্বিতম্বি কেন?"

"সত্যি বলব? বড় অভাবে পড়ে গেছি। বাড়িটা না বেচলেই নয়।"

পলাশ বললে, "আমাকে পনেরো হাজার দিলে ওঠার কথা ভাবব।"

ভানু বললে, "দশ, নগদ দশ হাজার। আজ বললে, কাল।"

পলাশ বললে, "নগদ পনেরো। কাল গেলে, সাতদিনের মধ্যে।"

"বেশ তাই। ডাক্তারবাবু সাক্ষী।"

ভানুবাবু মনমরা হয়ে সরে পড়লেন। রমাদি পলাশকে বললেন, "তুমি তো কম যাও না। একালের হালচাল বেশ রপ্ত করেছ! টাকার প্যাঁচ বেশ ভালই মারলে।"

"এর আগে একবার এসে টাকার লোভ দেখিয়ে গিয়েছিলেন।"

প্রশান্তদা বললেন, "লোকটা এত বদ, ভোলার দলকে দিয়ে বিপদে ফেলার চেষ্টা করেছিল। ভোলা ভদ্র পরিবারের বখে যাওয়া ছেলে; কিন্তু মাস্টারমশাইকে ভীষণ শ্রদ্ধা করে। একসময় আমরা দু'জনেই মাস্টারমশাইয়ের প্রিয় ছাত্র ছিলুম। ভোলার বাবা আজ আমার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। মাস্টারমশাইয়ের কথা উঠতে আমাকে সব বললে। ভোলা নিতে এসে দিয়ে গেছে। ও খেয়াল করতে পারেনি, এই বাড়িতে মাস্টারমশাই থাকতেন। মাস্টারমশাইয়ের কথা উঠতে আমাকে সব বললে। ও ঘরের ছবিটা দেখে চমকে ওঠে। যার কাছে যা ছিল, সব ও-ঘরের টেবিলে রেখে সরে পড়ে।"

রমাদি বললেন, "এই সব অপরাধীর সঙ্গে তোর আলাপ?"

"ডাক্তারের সঙ্গে মানুষের একটাই সম্পর্ক রে দিদি, রুগি আর চিকিৎসক। কাকে রাখবি আর কাকে ফেরাবি?

"যাক, আমি এবার বেরিয়ে পড়ি।"

ন'টার সময় অক্ষয়কাকা দোকান খুললেন। গোল একটা কাঠে সোনার বালা পরিয়ে একমনে ছিলে কাটছেন। এ যেন তাঁর তন্ময় সাধনা। পলাশ লাঠি ঠুকঠুক করে দোকানে এসে ঢুকল। অক্ষয়কাকার চেহারাটা ভীষণ খারাপ দেখাচ্ছে আজ। শব্দ শুনে, মুখ তুলে তাকালেন। দুর্বল গলায় বললেন, "এসো বাবু। বোসো।"

"কী হয়েছিল আপনার? দোকান খোলেননি?"

"আর বোলো না বাবু, মরতে মরতে বেঁচে গেলুম। ফুড পয়েজনিং। এখনও বেশ দুর্বল। কেমন আছ তোমরা?"

পলাশ চুপ করে রইল।

"মা ভাল আছেন তো?"

পলাশ খুব শান্ত, স্থির গলায় বললে, "মা, পাগল হয়ে গেছেন।"

"অ্যাঁ, সে কী!" অক্ষয়কাকার হাত থেকে যন্ত্র খসে পড়ল।

"আর তিন-চার দিন পরে আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি।"

"কোথায় যাচ্ছ?"

"এলাহাবাদে।"

"এলাহাবাদে? কবে ফিরবে?"

"আর ফিরব না।"

"সে কী!" অক্ষয়বাবু চোখ থেকে গোলমতো রুপোলি ফ্রেমের চশমাটা খুলে ফেললেন. "কে আছে সেখানে?"

পলাশ সব কিছু খুলে বলল। অক্ষয়বাবু মুখ ভার করে তাকিয়ে রইলেন। শেষে বললেন, "সেটা কি ঠিক হবে? সব ছেড়েছুড়ে এখানকার পাট চুকিয়ে, সব স্মৃতি মুছে দিয়ে চলে যাবে? আমি তো ছিলুম পলাশ, বুড়ো হলেও ক্ষমতা রাখি। মা'কে আমি কবিরাজি করে তিন দিনে ভাল করে দোব। গ্যারান্টি। সেরকম কবিরাজ আমার হাতে আছে। সাত দিনের পরিচয়ে তুমি দুম করে সব পাট উঠিয়ে চলে যাবার ঝুঁকি নিচ্ছ পলাশ! আমার ভাল লাগছে না বাবা।"

"প্রশান্তদা, রমাদিকে আপনি দেখেননি, দেখলে আপনার আর ভয় করবে না।"

"বড় লোককে বিশ্বাস নেই পলাশ। আজ একরকম, কাল একরকম। তোমার জন্য আমি অনেক ভেবেছি। আমার তো কেউ নেই, তুমি আমার পার্টনার হতে পারো। তোমাকে আমি জড়োয়াসেটিং-এর কাজ শিখিয়ে মাসে হেসেখেলে তিন-চার হাজার টাকা রোজগারের পথ খুলে দিতে পারি। ঘোরাঘুরি নেই, ছোটাছুটি নেই, বসে-বসে কাজ। পুরোপুরি আর্টের লাইন।"

"কাকাবাবু, আমি লেখাপড়া করতে চাই। আমার বাবা বলেছিলেন, অধ্যাপক হতে।"

"আবার ওই দলাদলি, রাজনীতির মধ্যে যাবে? দেখছ তো কী অবস্থা? তার চেয়ে হাতের কাজ অনেক ভাল। তুমি দ্যাখো, আমার জীবনে কোনও ঝামেলা আছে? সারাদিন আপন মনে ঠুকঠুক করে কাজ করি, রাতে শান্তিতে ঘুমোই। কে কংগ্রেস, কে সি· পি· এম· আমার কাঁচকলা। তুমি বিষয়টা আর-একবার ভাল করে ভেবে দ্যাখো। আমার বিদ্যেটা তোমাকে দিয়ে যেতে চাই। এক শ্রেণীর লোকের হাতে প্রচুর পয়সা, আরও পয়সা আসবে, তোমার কাজের অভাব হবে না। দ্যাখো, ভেবে দ্যাখো, এখনও তিন-চার দিন সময় তো রয়েছে!"

অক্ষয়কাকা চোখে চশমা লাগিয়ে আবার কাজে মন দিলেন। পলাশ ঠুকঠুক করে বাড়ি ফিরে এল। রমাদি বললেন, "আমাকে একটু সাহায্য করবে পলাশ! মা'কে স্নান করাব। কিছু না, তুমি শুধু ধীরে-ধীরে মাথায় জল ঢালবে।"

মায়ের বড় অদ্ভুত অবস্থা এখন। ওষুধের ঘোর লেগে আছে চোখে। কী করছেন, কোথায় পা ফেলছেন, হুঁশ নেই কোনও। এইভাবে মা'কে রাখা হবে। এই ভাবেই থাকতে থাকতে মা হয়তো একদিন সুস্থ হয়ে উঠবেন। সবই হয়তো…।

দুপুরে রমাদি বললেন, "এত সুন্দর সেতারটা, মাঝে-মাঝে নিয়ে বসতে পারিস তো। সুরের মতো জিনিস আছে। এলাহাবাদে আমার ওস্তাদজি আছেন, ওখানে তোর শেখার ব্যবস্থা করে দোব। একসময় আমার খুব ভাল হাত ছিল।"

রমাদি সেতারটা পেড়ে বাজাতে বসলেন। থমথমে দুপুর। বাইরে ঝলমল করছে রোদ। খাওয়াদাওয়ার পর মা ও-ঘরে। বিছানায় বেহুঁশ পড়ে আছেন গুটিসুটি মেরে। দেখলে মায়া হয়। জল এসে যায় চোখে। রমাদি খুব মিষ্টি একটা সুর ধরেছেন। এত মিষ্টি করে বাজাচ্ছেন যে, শুনতে শুনতে ঘুম এসে যাবার মতো হচ্ছে পলাশের। কত দিন ঘুমোয়নি ভাল করে। খালি চিন্তা, চিন্তা, দুশ্চিন্তা।

একসময় সেতার নামিয়ে রেখে রমাদি পলাশকে বোঝাতে লাগলেন, এলাহাবাদে গিয়ে কীভাবে কী হবে! কী কী পরিকল্পনা আছে। একেবারে গঙ্গার ধারে নিজের থাকার জন্যে দোতলা একটা বাড়ি করিয়েছিলেন। বেশি বড় নয়। নিরিবিলিতে থাকবেন, ধ্যানধারণা করবেন। এই ছিল ইচ্ছে।

এবার ফিরে গিয়ে পলাশদের নিয়ে সেই বাড়িতেই উঠবেন। আর বড় বাড়িটা ছেড়ে দেবেন ফাউণ্ডেশানের ব্যবহারের জন্যে। ওই বাড়িটায় আলাদা একটা হেলথ সেন্টার হবে। পলাশ পড়বে, ছোটদের পড়াবে, সেতার শিখবে, ভাষা শিখবে, আর তার দায়িত্বে থাকবে ফুলবাগান।

রমাদি পলাশের ভবিষ্যৎ জীবনের পুরো ছবিটা চোখের সামনে উজ্জ্বল রঙে জ্বলজ্বল করে এঁকে দিলেন। পলাশের মনে হতে লাগল, আর দেরি কেন! পারলে কালই তো চলে যাওয়া যেতে পারে।

রাতে খাওয়াদাওয়ার পর প্রশান্তদা বললেন, "খুব ভেবেচিন্তে আজই একটা পরিকল্পনা তৈরি করে ফেলা যাক। এত সব জিনিস, কিছু না হয় আমাদের বাড়িতে সরানো গেল, কিছু মনে হয় বিক্রি করে ফেলাই ভাল। চেয়ার, টেবিল, খাট, আলনা এ তো সব পুরনো আমলের ডিজাইন, একালে অচল। আমার ওই কম্পাউণ্ডার ছেলেটিকে বলি, কালই একটা লরিতে তুলে যারা পুরনো ফার্নিচার কেনে তাদের ওখানে রেখে আসুক। যা দাম পাওয়া যায় পরে আমি এলাহাবাদে দিয়ে আসব। কী পলাশ, তুমি কী বলো?"

পলাশ পরম উৎসাহে বললে, "আপনারা যা বলবেন, আমার আপত্তি নেই।"

"অনেক বই আছে। মাস্টারমশাইয়ের নিত্য সঙ্গী। বেশির ভাগই নানা ধরনের পাঠ্যপুস্তক। ও আর রেখে কী হবে! যদি কারও কাজে লাগে দিয়ে দাও, নয়তো ফেলে দাও। স্মৃতি হিসেবে তুমি যদি কিছু রাখতে চাও, কাল সব বেছে বেছে একটা স্যুটকেসে ভরে ফেলো। বেশি কিছু তো নিয়ে যাওয়া যাবে না, বোঝা বেড়ে যাবে। যতটা হালকা হওয়া যায়। বিছানাপত্তর, মাস্টারমশাইয়ের জামাকাপড় যারা নিতে চায় তাদের দান করে দাও। ওসব তোমার কোনও কাজে লাগবে না। যত দেখবে তত মন খারাপ হবে, যতদিন দেখবে ততদিনই মন খারাপ হবে। তোমার সামনে জীবনের দীর্ঘ পথ, নতুন ইতিহাস তৈরি করো। দামি জিনিস যেমন গয়নাগাটি, নগদ টাকা, সাবধানে সঙ্গে রাখো। মা তো পরবেন না, দিদি কাল তুই দেখিস তো। ব্যাঙ্ক, পোস্টাপিস, ইনসিওরেনস, ওসব ধীরে-ধীরে হবে। আইনের মারপ্যাঁচ আছে।"

একে একে সবাই শুয়ে পড়লেন। পলাশ জেগে শুয়ে আছে। ভেতরটা তার উত্তেজনায় লাফাচ্ছে। নতুন জায়গা, নতুন জীবন! এলাহাবাদ কত ভাল জায়গা। কলকাতা তার আর ভাল লাগে না। এই কলকাতা তার সর্বনাশ করেছে। চিরকালের জন্যে তার একটা পা নিয়ে নিয়েছে। শুধু একটাই দুঃখ, শ্যামলীর সঙ্গে আর দেখা হবে না। নাই বা হল! সেই যে সেদিন চলে গেল, আর এসেছে! ভেবেছিল আজ আসবে। আজও এল না।

ভাবতে ভাবতে পলাশের ঘুম এসে গেল।

"পলাশ, পলাশ, এই পলাশ, কী ঘুম রে তোর?"

বাবার গলা।

"কী বলছ বাবা?"

"এই ঘরে একবার শোন।"

"তুমি কোন ঘরে?"

"দূর বোকা, আমি পড়ার ঘরে। ডাক শুনে বুঝতে পারছিস না?"

পড়ার ঘরে বাবা বসে আছেন চেয়ারে। নাকের ওপর ঝুলছে সেই পড়ার চশমাটা। যে-চশমাটা দেখে পলাশ হাসাহাসি করত,

নাকে ঝুলছে অর্ধচন্দ্র। কী সুন্দর চেহারা হয়েছে বাবার। ফর্সা টকটকে রঙ। বড়-বড় চোখ।

পলাশ বলল, "তুমি কখন এলে বাবা?"

"আমি তো কোথাও যাইনি বাবা।"

"তবে যে সবাই বললে, তুমি চলে গেছ। তুমি আর কোনওদিন ফিরবে না?"

"ধুর পাগল। আমি তো এইখানেই আছি। তুই নাকি আমাকে তাড়িয়ে দিবি?"

"সে কী! তুমি এইরকম বলছ?"

"এই তো, তোরা সব জিনিস ফেলে দিবি, দিয়ে দিবি, বিক্রি করে দিবি?"

"বা রে, আমরা যে এলাহাবাদে যাব।"

"কেন? কোথায় যাবি? কার কাছে যাবি?"

"তোমার ছাত্র প্রশান্তদা, তাঁর বোন রমাদি।"

"যাস না, যাস না, নিজেতে নিজে থাক। নিজে নিজে বড় হ। কারও সাহায্য নিস না। তুই আমার কাছে থাক। আমাকে নিয়ে থাক।"

পলাশের ঘুম ভেঙে গেল। রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ভোর হব-হব। ঘরে একটা সুন্দর গন্ধ ঘুরে বেড়াচ্ছে। ধূপ নয়, সেন্ট নয়। ফুলের গন্ধ।

পলাশ উঠে বসল। দরজা খুলে বাইরে এল। ইচ্ছে করছিল, ছুটে যায়, পড়ার ঘরে। ভেতর থেকে বন্ধ। প্রশান্তদা শুয়ে আছেন ও-ঘরে। একটু বেলায় উঠবেন। দালানের রকে দেয়ালে ঠেস দিয়ে পলাশ বসল। ধীরে-ধীরে অন্ধকার কেটে আসছে। ভোরের প্রথম পাখি ঘুম-জড়ানো চোখে থেমে থেমে ডাকছে, যেন বলছে, 'মা আমি উঠে পড়েছি।'

১০

বেলা দশটা নাগাদ একটা ভটভটি চেপে, সেই বিশ্রী লোকটি এল, যাকে দেখলেই পলাশের গা জ্বালা করে। বাড়িঅলা ভানু। ঘেমে গেছে। মুখটা চকচক করছে। উত্তেজনায় হাঁফাচ্ছে। অন্য সময় হলে খুব হম্বিতম্বি করত, অভদ্রতা করত। সে উপায় আর নেই। ডাক্তারবাবু সব অসভ্যতা শেষ করে দিয়েছেন।

অদ্ভুত একটা দেঁতো হাসি হেসে বললে, "টাকাটা এনেছি। ক্যাশ পনেরো হাজার। ডাক্তারবাবু কোথায়?"

পলাশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর কোনওরকম গা না লাগিয়ে, যেন প্রশ্নটা বুঝতে পারেনি এইভাবে পাল্টা প্রশ্ন করল, "ডাক্তারবাবু, কে ডাক্তারবাবু?"

ভানু ভীষণ অবাক হয়ে বললে, "সে কী! ডাক্তারবাবুকে চেনো না? ডাক্তার প্রশান্ত ঘোস। যাঁর সামনে অত কথা হল।"

রমাদি বাথরুমে স্নান করছেন। মা'কে একবার তোলা হয়েছিল, আবার ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এই সুযোগ। আজ লোকটাকে খেলাতে হবে।

পলাশ বললে, "ও প্রশান্তদা। তিনি বেরিয়ে গেছেন।"

"তা হলে টাকাটা?"

"কী টাকা? কার টাকা?"

"কী আশ্চর্য! সব ভুলে গেলে নাকি! কী ফাইনাল হল সেদিন? ক্যাশ পনেরো নিয়ে তিন দিনের মধ্যে বাড়ি ছেড়ে দেবে।"

"কেন?"

"কেন কী! তুমি যেন আকাশ থেকে পড়লে?"

"ঠিক বলেছেন। আমি কেন পড়ব, আপনিই তো ফেলে দিলেন।"

"সে আবার কী!"

"বাড়ি ছেড়ে দিলে, আমরা যাব কোথায়? এত দিনের ভাড়াটে, বলা নেই কওয়া নেই উঠে যাব! উঠে গেলে এই ভাড়ায় বাড়ি পাব আর কোথায়?"

রাগে ভানুর মুখ-চোখ লাল হয়ে গেছে। কথা আটকে যাচ্ছে, "তার মানে! তুমি আমার সঙ্গে রসিকতা করছ! আমার খদ্দের বসে আছে। সেদিন সব ঠিক হয়ে গেল। আজ আবার ন্যাকামো হচ্ছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, ন্যাকামোই হচ্ছে। বাড়ি আমি ছাড়ব না। আপনার ক্ষমতা থাকে, আমাদের ওঠান।"

"আবার তোমাদের বদমাইশি শুরু হল?"

"হল।"

"এবার আমি মেরে তাড়াব।"

"বললুম তো, চেষ্টা করে দেখুন।"

কথায় কথায় কেউই লক্ষ করেনি, পলাশের মা উঠে এসেছেন। ভানু জানে না। কিছুই সে শোনেনি। শোভনার মুখ-চোখ একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছে গত কয়েকদিন।

বেরিয়ে এসেই বললেন, "এনেছ? কোথায় রাখলে, কোথায় রাখলে আমার কাটা মুণ্ডু? রক্ত কই, রক্ত! ছেলের রক্ত, মায়ের রক্ত! কোথায়! কোথায়?"

কথা বলতে বলতে শোভনার চোখ লাল হয়ে উঠছে। মুখের চেহারা পাল্টে যাচ্ছে। "কোথায়! কোথায় আমার কাটা মুণ্ডু। তুমি রাখলে কোথায়!"

এলটিং বেলটিং সই লো
কে সি দাশের দই লো
তার সাথে দি খই লো
চিঁড়া, কদলী লই লো
খেয়ে যা খেয়ে যা দধিকম্ম
পুণ্যি হবে রে জন্ম জন্ম ॥

কে সি দাশ প্রাইভেট লিমিটেড

আবিষ্কারক : রসোমালাই

কলকাতা:১১ এসপ্ল্যানেড ইস্ট ২৩-৫৯২০ ব্যাঙ্গালোর:৪৮ সেন্ট মার্কস রোড, ৫৭-৫০০৩

শোভনা এগোচ্ছেন, ভানু পেছোচ্ছে। হঠাৎ এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে, শোভনা খিলখিল করে হাসতে লাগলেন। সেই হাসি শুনে পলাশেরও রক্ত হিম হয়ে গেল। মানুষ এভাবে হাসতে পারে, পলাশের ধারণাই ছিল না। মা'কে তাড়াতাড়ি জড়িয়ে ধরল।

ভানু দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললে, "তা হলে কী হবে ?"

পলাশ বললে, "আমি সেই কাগজটা খুঁজে পেয়েছি। আপনার বাবার সঙ্গে আমার বাবার চৌষট্টি বছরের চুক্তি হয়েছিল। বাড়িটা আমরা ছাড়ছি না। আপনার ক্ষমতা থাকে ওঠাবার চেষ্টা করুন।"

শোভনা হাসি থামিয়ে বললেন, "পালাচ্ছে, লোকটা খুন করে ভয়ে পালাচ্ছে রে।"

ভানুর মোটর সাইকেল বিকট শব্দ করতে করতে চলে গেল। পলাশ প্রস্তুত। সে ঠিক করে ফেলেছে, কী করবে আর কী করবে না। বাবা বলতেন, স্ট্যাণ্ড অন ইওর ওন লেগস। নিজের পায়ে দাঁড়াও। কেউ ধরে দাঁড় করাতে চাইলে সরিয়ে দিও। চিরকাল তোমাকে কেউ ধরে থাকবে না। পৃথিবী খুব কঠিন জায়গা পলাশ। নিজের লাঠি নিজেকেই হতে হবে, তা না হলে লাথি খাবে।

রমাদি বাথরুম থেকে স্নান সেরে বেরিয়ে এসে অবাক। পলাশ আর মা দু'জনে জড়াজড়ি করে উঠোনে দাঁড়িয়ে। "কী হল পলাশ ?"

"ভানু এসেছিল।"

"তারপর ?"

"ভয়ে পালিয়েছে।"

"টাকা দিয়ে গেছে ?"

"দিতে এসেছিল, নিইনি।"

"কেন ?"

"বাড়ি ছাড়ব না।"

"সে কী ! আমরা তো পরশু চলে যাব। আজই তো মালপত্তরের বিলিব্যবস্থা হবে।"

"আমরা যাব না দিদি।"

"তার মানে ? এ আবার কী কথা ?"

"বাড়িটা আমি কিনে নোব।"

"কিনে নেবে ? অত টাকা কোথায় !"

"আজ না পারি একদিন আমি কিনবই। এ আমার বাবার বাড়ি। এখানে তিনি ছিলেন। থাকবেন চিরকাল।"

"যাঃ, তোমার মাথাটাও গেল নাকি !"

"মাথা আমার ঠিক আছে দিদি। এ হল চ্যালেঞ্জ। আমি পালাব না। আমার এই দেড় ঠ্যাঙেই আমি লড়ব।"

"তুমি পাগল হয়ে গেছ।"

রমাদি মুখ ভার করে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে পলাশকে যখন তিনি ডাকলেন, তখন তাঁর চোখ ছলছল করছে, "পলাশ, আমি কি এমন কিছু করেছি বা বলেছি !"

"কেন দিদি ?"

রমাদির চোখে জল এসে গেছে, "তা না হলে তুমি হঠাৎ তোমার মত পাল্টালে কেন ? তোমার কি মনে হয়েছে, আমি অহঙ্কারী ? আমার মধ্যে তুমি অহঙ্কার দেখেছ ? আমি কি বদরাগী ? আমি কি মানুষকে আপন করতে জানি না ? জানিস তো আমার ছেলে নেই, মেয়ে নেই। কেউ নেই আমার। তোকে আমি প্রথম দিন থেকেই বড় ভালবেসে ফেলেছি রে পলাশ ! সেইটাই আমার অপরাধ, আমার ভুল। একদিন শুধু স্বপ্ন দেখেছি, তোকে মানুষ করব, তুই বড় হবি। আমি চোখের সামনে দেখেছি, যুবক পলাশের ছবি। আমার ভুল হয়েছে। জীবনের আর এক ভুল—পর তো আপন হয় না, আর এ যা যুগ, নিজের ছেলেই পর হয়ে যায়।"

রমাদির গাল বেয়ে এক ফোঁটা, দু' ফোঁটা করে জলের ধারা নেমেছে। পলাশও আর চোখের জল চাপতে পারল না। উনুনে গনগনে আগুন। পিঁড়েতে রমাদি বসে আছেন। সবে স্নান করেছেন, ভিজে এলোচুল। ফর্সা সুন্দর চেহারা। বড়-বড় চোখ। লম্বা-লম্বা চোখের পাতা, জলে ভেজা-ভেজা।

পলাশের ভেতরে অনেক দিনের অনেক কান্না জমে আছে। একটু আঘাতেই দু'চোখ উপচে গড়িয়ে পড়ে। বাইরের রকে এসে বসে রইল অনেকক্ষণ। চুপচাপ। ভেতরে লড়াই চলেছে, দুটো মনের। একটা মন বলছে, স্বপ্নটপ্ন সব বাজে। ওই অক্ষয়কাকা বলেছিলেন, তাই তুমি স্বপ্ন দেখলে। প্রশান্তদা আর রমাদিকে তো বাবাই তোমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন, না হলে কি যোগাযোগ হত। কারও সাহায্য ছাড়া মানুষ কি বড় হতে পারে ? আর একটা মন বলছে, বাবার সব কিছু মুছে যাবে সেটা কি ঠিক হবে ? সব স্মৃতি। বই, লেখা, তিরিশ বছরের একটা ঠিকানা ? আবার ওই মন বলছে, একটা ভাড়া-বাড়ি, খাট, চেয়ার, টেবিল, বিছানা, বালিশ, এমনকী একটা ছবি, কতদিন মানুষ ধরে রাখতে পারে ! সেই ছবিই ছবি, যা মনে থাকে। স্মৃতি জিনিস নয়। স্মৃতি হল সন্তান। যতদিন তুমি আছ, ততদিন বাবা আছেন।

পলাশ আর ভাবতে পারছে না। ভেতরটা যেন ফেটে যাচ্ছে। আঃ, এই সময় বিমানদাদু যদি কাছে থাকতেন ? দরজার কড়া নড়ে উঠল। প্রথমে পলাশ শুনতেই পেল না। কড়া এবার আর একটু জোরে বাজল। পলাশ দরজা খুলেই অবাক। এ কী অসম্ভব ব্যাপার ! এমনও হয়। সামনেই বিমানদাদু। লম্বা-চওড়া, রং যেন আরও ফর্সা হয়েছে। মুখ টকটকে লাল। ধবধবে সাদা ধুতি, সাদা হাফ-হাতা পাঞ্জাবি। কাঁধে ঝোলা ব্যাগ। মুখে ঝলমলে হাসি। "খুব অবাক হয়ে গেছ পলাশ ?"

পলাশ উত্তর দেবে কী ! আনন্দে বিস্ময়ে কেঁদে ফেলেছে। বিমানদাদু পলাশকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। কান্না-জড়ানো গলায় পলাশ বললে, "আপনি আমাকে ফেলে কোথায় চলে গিয়েছিলেন ? আমার কী বিপদ !"

মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বিমানদাদু বললেন, "তাই তো আমি ছুটে এলুম। জানো কি, গা-ঢাকা না দিলে ওরা আমাকে মেরে ফেলত পলাশ।"

রমাদি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে পলাশের মতোই অবাক। "বাবা, আপনি ?"

"হ্যাঁ, মা। জানি তুমি এখানে আছ। প্রশান্ত ট্রাঙ্ককলে আমাকে জানিয়েছে।"

পলাশ অবাক গলায় প্রশ্ন করল "আপনি রমাদিকে চেনেন ?"

"হ্যাঁ গো বাবা। আজকের চেনা ?"

রমাদি বললেন, "সেই যে সেদিন তোমাকে বললুম, এক মহাপুরুষ আমার জীবন পাল্টে দিয়েছেন পলাশ, ইনিই সেই মহাপুরুষ।"

পলাশ বললে, "আপনি কি এলাহাবাদ থেকে আসছেন ?"

"হ্যাঁ গো। ওখানে আমার স্বপ্ন তৈরি করছি, জীবন-স্বপ্ন।"

রকে যে চেয়ারটা পাতা ছিল, বিমানদাদু সেই চেয়ারে বসলেন। একে একে সব শুনলেন। পলাশকে বললেন, "তুমি ভেবো না। মেয়ে আমার ভাল হয়ে যাবে। এই অসুখের চিকিৎসা আমি করেছি। আমার স্থির বিশ্বাস মা সুস্থ হয়ে উঠবেন।"

রমাদি বললেন, "পলাশ, এবার তা হলে যাবে তো?"

"আমার দাদু যা বলবেন তাই হবে।"

"কোথায় যাবে?"

"এলাহাবাদ আশ্রমে।"

"নিশ্চয় যাবে। পলাশকে আমি নিজে হাতে তৈরি করে দিয়ে যাব। আমার কলকাতার পাট তো উঠে গেছে। পলাশের জীবন এখন শুরু হবে ওখানে, আমাদের কাছে।"

অক্ষয়কাকাবাবু এলেন কাসতে-কাসতে। তাঁর হাঁটা দেখে পলাশের মনে হল শরীর বেশ দুর্বল। বিমানদাদু বললেন, "আসুন, আসুন। কেমন আছেন আপনি?"

"ভাল আছি বললে মিথ্যে বলা হবে। বয়েস তো আর কমছে না, ক্রমশই বাড়ছে। আমি দেখলুম, আপনি এলেন। আর একটু পরেই আসতুম; কিন্তু আগেই আসতে হল। গোটাচারেক অচেনা, উটকো চরিত্র, এই রাস্তায় ঘুরঘুর করছে। আগে কখনও দেখিনি। মনে হল, আপনাকে অনুসরণ করছে।"

"ধরেছেন ঠিক। কলকাতায় পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার পিছু নিয়েছে। আমাকে ভয় দেখাচ্ছে। ওরা বিমলের লোক।"

"কে বিমল?"

"বড় আপনজন। আমার ছোট ভাই।"

"কী করতে চায়?"

"খুব সহজ কাজ। অন্তত এ-বাজারে। আমাকে সরাতে চায়।"

"কেন?"

"সেও খুব সহজ সরল ব্যাপার। বিষয়-সম্পত্তি। একেবারে দুই আর দুয়ে চারের মতো সোজা হিসেব।"

"তা হলে আমি আমার যৌবনটাকে আবার জাগিয়ে তুলি? হয়ে যাক নরমেধ যজ্ঞ!"

বিমানদাদু উদার হেসে বললেন, "কী হবে, ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করে! আমি তো আমার জায়গা খুঁজে পেয়েছি।"

"তা হলেও, আমাদের পাড়ায় এসে মাস্তানি করে যাবে?"

"যাক না। ওদের কাজ ওরা করুক। ওইটাই তো রোজগার ওদের।"

"থানার ও সি'র সঙ্গে আমার পরিচয় আছে।"

"আমারও আছে। অশান্তি করে লাভ নেই। সময়, স্বাস্থ্য, দুটোই নষ্ট হবে।"

"যাই হোক, একটু সাবধানে চলাফেরা করবেন। বলেন তো আমার জনা-দুই চেলাকে জুড়ে দি।"

"না, না। কোনও দরকার নেই। আমি তো আর প্রাইম মিনিস্টার নই।"

অক্ষয়কাকা উঠে পড়লেন। রাস্তায় বেরিয়ে সেই চারটে চরিত্রকে দেখতে পেলেন না। কোথায় ঘাপটি মেরে আছে কে জানে! এদিক-ওদিক তাকালেন, সব ফাঁকা। বেশ পাকা লোক। জানে কখন কী ভাবে গা-ঢাকা দিতে হয়!

বিমানদাদু হাসতে হাসতে উঠে পড়লেন, "কী কষ্ট! আজ আর আমি বেরোব না। বেচারাদের সারাদিন হাঁ করে বসে থাকতে হবে।"

পলাশ ভয়ে-ভয়ে বললে, "আপনার কিছু ক্ষতি করবে না তো!"

"কী আর করবে! এই দেহটা ছাড়া আমার আর কী আছে! ঝোলার মধ্যে আছে গীতা আর মহাভারত আর কথামৃত।"

বিমানদাদু স্নান করতে গেলেন। রমাদি বসলেন রাঁধতে। মা আর আগের মতো ঘুমোতে পারেন না। এখন জেগে থাকলেও বেশি কথা বলেন না। গুম মেরে বসে থাকেন। মাথার চুল ছেঁড়েন। আপন মনে হাসেন। তিনি আছেন, তিনি কিন্তু হারিয়ে গেছেন।

বিমানদাদু স্নান সেরে এসে গীতাপাঠে বসলেন। বাবাও নিত্য গীতাপাঠ করতেন, আর মা শুনতেন। আজ যেন আবার ফিরে এল পুরনো সেই দিন। মা আজও শুনছেন। কখনও মাথা এদিকে ঘোরাচ্ছেন, কখনও ওদিকে। যেন বুঝতে চাইছেন এ-কার কণ্ঠস্বর। মুখে মাঝে-মাঝে এমন একটা ভাব হচ্ছে, যেন সুস্থ হয়ে উঠবেন এক্ষুনি। এক্ষুনি বিমানদাদুকে বলবেন, 'বাবা কখন এলেন!

জঙ্গলে পথ হারালে একদিন না একদিন মানুষ ফিরে আসার পথ খুঁজে পায়। মনের জঙ্গলে পথ হারালে ফিরে আসা কঠিন ব্যাপার। পলাশের তবু মনে হল, সারা জীবনই কি মানুষের খারাপ দিন যেতে পারে! একদিন-না-একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে।

পাঠ শেষ করে বিমানদাদু বললেন, "আজ, তোমার বাবাকে আমি সেতার শোনাব। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অমন রসিক মানুষ আমি খুব কম দেখেছি। সেতারটা কোথায়!"

রমাদি সেতার এনে দিলেন। সেই খাঁখাঁ দুপুরে, বাতাসের গরম ঝাপটায় সুর উড়তে লাগল নিরাশ্রয়, কাতর পাখির মতো। পলাশ জানলা দিয়ে একবার উঁকি মেরে দেখল। অক্ষয়কাকার দোকান বন্ধ। পান-সিগারেটের দোকানে দুটো অচেনা ছেলে বোতলের জল খাচ্ছে আর এদিকে-ওদিকে তাকাচ্ছে। ওরাই মনে হয় বিমলের লোক। পলাশ অবাক হয়ে দেখলে, আরও তিনটে ছেলে, অক্ষয়কাকাবাবুর দোকানের রকে এসে বসল। কোথায় যেন দেখেছে ওদের। একজনের সঙ্গে চোখাচোখি হতে, সে একটু হাসল। হাতের একটা আঙুল তুলে ইশারা করল। পলাশ বুঝল, যে যাই বলুক, অক্ষয়কাকাবাবু ছেড়ে দেবার মানুষ নন। এখনও একবার আঙুল নাড়লে বিমলের মতো সাতটা মানুষ নিমেষে উবে যাবে। কাকাবাবু ভাল'র দেবতা, খারাপের যম।

সন্ধের কিছু পরেই অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটল। লাল রঙের খোলা একটা জিপগাড়ি বাড়ির সামনে এসে থামল। সামনে ড্রাইভারের পাশে দু'জন, পেছনে চারজন। সামনের দু'জনের মধ্যে একজন অক্ষয়কাকাবাবু। বাকিদের মধ্যে একজনও পলাশের পরিচিত নয়। অক্ষয়কাকাবাবুর পাশে যিনি বসে আছেন বেশ হোমরাচোমরা। ফর্সা, গোলগাল চেহারা। সাজপোশাকও সুন্দর।

অক্ষয় কাকাবাবুর আজ একেবারে অন্য মূর্তি। প্রদীপ জ্বেলে সারাদিন যিনি সোনার গয়নায় ঠুকঠুক করে নকশা তোলেন, ইনি সে অক্ষয় নন। অক্ষয়কাকাবাবু নেমেই হুকুম করলেন "নামাও।" পেছনের চারজনের মধ্যে তিনজন হিড়হিড় করে টেনে আর একজনকে নামাল। যাকে নামাল, তার অদ্ভুত চেহারা। লোকটাকে ধরে কে যেন পাকিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। অক্ষয়বাবু এবার বললেন, "পেটাও।"

পলাশ ভেবেছিল ওই লোকটাকে পেটাবার কথা বলছেন। তা নয়। তীক্ষ্ণ একটা সিটি বাজার সঙ্গে-সঙ্গে রাস্তায় ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেল। সে এক সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। দোকানদাররা তাড়াতাড়ি দোকানের ঝাঁপ নামাতে শুরু করেছে ভয়ে।

বিমানদাদু বেরিয়ে এসে বলছেন, "কী ব্যাপার ! হল কী ?"

তারপর পাকতেড়ে চেহারার লোকটির দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বললেন, "আরে বিমল, তুমি কোথা থেকে এলে !"

"আমি আসিনি, আমাকে তুলে এনেছে।"

হোমরাচোমরা লোকটি বললেন, "এবার ফেলে দেওয়া হবে।" জিপ যিনি চালাচ্ছিলেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "উমেশ, গঙ্গায় এখন জোয়ার না ভাটা !"

"জোয়ারই হবে।"

"গুড, ভেসে চলে যাবে ডায়মণ্ডহারবারের ওসান পয়েন্টে। ভাল জায়গা।"

অক্ষয়কাকাবাবু বললেন, "ভেতরে চলো। তোমার চেলাদের এতক্ষণে ভবসাগর তারণ হয়ে গেছে। ব্যাটা নেশাখোর, সব সময় জানবে বাবা, ওল্ড ইজ গোল্ড। পাপ করতেও পুণ্য চাই। দণ্ডদাতা হতে গেলে মেরুদণ্ডের প্রয়োজন।"

হোমরাচোমরা লোকটি হল ক্ষমতাসীন দলের একজন বড় নেতা। অক্ষয়কাকাবাবুর হাতে তৈরি। ব্যস্ত মানুষ। তিনি বললেন, "কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। কাগজে একটা মুচলেকা লিখিয়ে নিয়ে বেশ করে কড়কে ছেড়ে দিন। আর বিমানবাবুকে বলে দিন, তাঁর দখল নিয়ে নিতে। আজই, আমাদের সামনে।"

বিমানদাদু হাসতে-হাসতে বললেন, "অক্ষয় আমাকে ভালবাসে, তাই এত হাঙ্গামা করে ফেলেছে। আমি বারণ করেছিলাম। আমার সর্বনাশ যা হবার হয়ে গেছে। হাজার-হাজার টাকার বাদ্যযন্ত্র, ভাল-ভাল কাঠ, বহু বছরের পাকা লাউয়ের খোল ভেঙে, পুড়িয়ে শেষ করে দিয়েছে। আমার যত লেখা, ডায়েরি, অতীত ইতিহাস সব শেষ। ইটের দেওয়াল আর মাথার ওপর ছাত, এই জড়-বস্তুর ওপর আমার কোনও লোভ নেই ভাই। ওকে আমার সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও ভাই।"

নেতা বললেন, "একবারে সরিয়ে দিলে ক্ষতি কী !"

"তোমরা সরাবার কে ? ও নিজেই সরে যাবে। শরীরে কিছু নেই। মনও ফাঁকা। যাও যাও, চলে যাও। আমার আর ভাল লাগছে না।"

ওরা যেমন এসেছিল সেইভাবেই একে-একে চলে গেল। নেতা বললেন, "প্রয়োজন হলেই আমাকে বলবেন।" হঠাৎ সেই পাকতেড়ে চেহারার বিমল ফিরে এল। সিল্কের পাঞ্জাবিতে যা অপূর্ব দেখাচ্ছে ! বাবা বলতেন, 'পলাশ, চেহারা অনুসারে সাজপোশাক করতে হয়। পয়সা আছে বলেই যা খুশি তাই পরা যায় না।' বিমল এসে সোজা বিমানদাদুর পায়ে, "দাদা, আমাকে ক্ষমা করো।"

বিমানদাদু সোজা দাঁড়িয়ে আছেন দেবতার মতো। মুখে অদ্ভুত পবিত্র হাসি। পায়ের কাছে সিল্ক জড়ানো হাড়ের খাঁচা।

বিমানদাদু বললেন, "ভয়ে বলছিস, না ভক্তিতে ?"

"ভক্তিতে। বিশ্বাস করো, ভক্তিতে। আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে।"

"সে কী রে ! তুই তো সকলের সর্বনাশ করে বেড়াস। তোর সর্বনাশ আবার কে করলে !"

১১

একে-একে সব চলে যাচ্ছে। ডাক্তারবাবুর কম্পাউণ্ডার লোকজন, লরি, টেম্পো সব নিয়ে হাজির। বিমানদাদু মায়ের হাতে একটা জপের মালা ধরিয়ে দিয়েছেন। সেইটা নিয়েই মা বেশ মেতে আছেন। চারপাশে কী হচ্ছে, কোনও খেয়াল নেই। মাঝে-মাঝে এপাশে-ওপাশে তাকাচ্ছেন, আবার পরক্ষণেই মালা ঘোরাচ্ছেন। একবার শুধু বলেছেন, 'হ্যাঁ রে ভূমিকম্প হচ্ছে বুঝি। ভূমিকম্প ! তোরা সব গর্তে ঢুকে যা। ইঁদুরের গর্তে। দেখছিস না, চারপাশে সব বেড়াল ঘুরে বেড়াচ্ছে। বড়-বড় বেড়াল।'

পুরোহিতমশাই এসে পড়েছেন। বিমানদাদুর নির্দেশে বাবার শ্রাদ্ধীয় একটা কাজ পলাশকে এই বাড়িতে করে যেতে হবে। কাজের শেষে বাবার সব জামাকাপড় দুস্থদের দান করা হবে। প্যাকেট প্যাকেট মিষ্টি এসেছে। পলাশের কেমন যেন ঘোর এসে গেছে। এত গতি চারপাশে ! এ আসছে, সে আসছে। মাল উঠছে। বাঁধাছাঁদা হচ্ছে। এক জীবন শেষ হয়ে আর-এক জীবন শুরু হতে চলেছে। বিমানদাদুর মতো।

বেলা চারটের সময় কাজ শেষ হল। সব শেষে এক প্রবীণ মানুষ মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে বিদায় নিলেন। বাবার পুরো-হাতা সাদা শার্ট পরে তিনি যখন চলে যাচ্ছেন, পেছন থেকে দেখে পলাশের মনে হল, ঠিক যেন তার বাবা হেঁটে চলেছেন, ধীরে-ধীরে। বিমানদাদু, সকালে ঠিকই বলেছেন, 'মানুষের মধ্যেই হারানো মানুষকে খুঁজে পাবে। ছবিতে নয়, ফেলে যাওয়া জিনিসে নয়।'

দুপুরে রেজিস্ট্রি-ডাকে একটা চিঠি এসেছিল। বিমানদাদু খুললেন। কলকাতার বড় এক ট্র্যাভ্‌ল্‌ এজেন্ট লিখছে পলাশের বিদেশ যাবার সব ব্যবস্থা তারাই করবে। দিল্লির নির্দেশ। খবর এসেছে, পুরস্কারের টাকা বিদেশে গিয়ে নিতে হবে। সেখানে একটা অনুষ্ঠান হবে। বিমানদাদু বললেন, "এসব এখন থাক। ওখানে গিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবা যাবে। সময় আছে। তাড়াহুড়োর কিছু নেই।"

বাড়িটা একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে। জিনিসপত্র সব পাচার। কোথাও কিছু নেই। কথা বললে গমগম করে উঠছে। একটু বেশি রাতে ভানুবাবু এলেন। বেজায় খুশি, যখন শুনলেন কালই বাড়ির দখল তিনি পেয়ে যাচ্ছেন। আর পনেরো হাজার টাকাও তাঁকে দিতে হচ্ছে না।

বিমানদাদু বললেন, "বাড়িটা বেচে দিচ্ছেন ?"

"হ্যাঁ, খুব ভাল দাম পাচ্ছি।"

"নিশ্চয় অবাঙালি।"

"তা তো বটেই, তা না হলে দাম পাওয়া যায় !"

বিমানদাদু দুঃখের হাসি হেসে বললেন, "তা বেশ। তা বেশ।"

পলাশের কেবলই মনে হচ্ছে, শ্যামলী তো আচ্ছা মেয়ে ! সেই যে গেল আর একবারও এল না। এত রাগ। যাবার আগে, তার নামে একটা চিঠি পোস্ট করে যাবে। আর হয়তো দেখা হবে না কোনওদিন।

পলাশ লিখল, স্নেহের শ্যামলী···।

স্নেহের শব্দটা লিখে তার তেমন ভাল লাগল না। বুড়োটে-বুড়োটে লাগছে। কেটে লিখল :

এই শ্যামলী

তুই তোর রাগ নিয়ে, তোদের রাজপ্রাসাদে বসে থাক। আমি এদিকে চললুম। আর ফিরব না। আমাদের এখানকার সংসার ভেঙে গেল। কিছু আর রইল না। আবার নতুন করে শুরু হবে অন্য জায়গায়। প্রথমে যাব এলাহাবাদ। সেখান থেকে আমেরিকাও যেতে পারি। ভাবছিস মিথ্যে কথা ! তা হলে দশ তারিখের কাগজের তিনের পাতার পাঁচের কলামটা দেখিস। জানিস তো, আমার মা পাগল হয়ে গেছেন। আর শুনলে সুখী হবি, আমি জন্মের মতো খোঁড়া হয়ে

গেছি ! তোর কথা প্রায় মনে পড়ে। পরেও পড়বে। বিশ্বাস কর, তোকে আমি ভীষণ ভালবাসি। তবে খোঁড়া আর গরিব পলাশকে তুই কি আর ভালবাসবি ! তোর নতুন-নতুন বন্ধু হবে। দিনকতক পরে বিলেত চলে যাবি পড়তে। তোর কী মজা ! ফিরে আসবি মেমসায়েব হয়ে। জীবনে যদি কোনওদিন বড় হতে পারি, তা হলে তোর সঙ্গে আবার দেখা করব। তখন চিনতে পারবি তো ! যে জায়গায় যাচ্ছি, তার ঠিকানাটা এখনও জানি না। আর আমার ঠিকানায় তোর কী হবে ! চিঠি লিখে সময় নষ্ট ! ভাল থাকিস। দুপুরে আচারটাচার করলে আমার নাম করে একটুখানি গাছতলায় ফেলে দিস। ভাল থাকিস। ইতি তোর পলাশ।

চিঠিটা খামে ভরে ঠিকানা লিখে পলাশ সাইড-ব্যাগে রেখে দিল। স্টেশানে গিয়ে ট্রেনে ওঠার আগে ফেলে দেবে। বিমানদাদু বাইরের রকে বাতাসে বসে ছিলেন। পলাশকে ডাকলেন। "বোসো আমার পাশে। এ-বাড়িতে আজই আমাদের শেষ রাত। কীরকম লাগছে তাই না ! কী আশ্চর্য দ্যাখো, কীভাবে আমি তোমাদের সঙ্গে জড়িয়ে গেলুম ! তুমি আবার কীভাবে রমার সঙ্গে জড়িয়ে গেলে। জানো, বিয়ের আগে রমা আমার কাছে সেতার শিখত। এসব কার খেলা ! একজনের উপর বিশ্বাস রাখবে সব সময়। তিনি। এ সবই তাঁর খেলা। অদৃশ্য। তিনি অনাদি। তিনি অনন্ত।"

বিমানদাদু অদ্ভুত সুন্দর ভরাট গলায় গান ধরলেন,

তাঁহারে আরতি করে চন্দ্র তপন,
দেব মানব বন্দে চরণ—
আসীন সেই বিশ্বশরণ
তাঁর জগৎমন্দিরে ॥
অনাদিকাল অনন্তগগন
সেই অসীম-মহিমা মগন—
তাহে তরঙ্গ উঠে সঘন
আনন্দ নন্দ-নন্দ রে ॥

বিমানদাদু যে এত ভাল গান করেন, পলাশের জানা ছিল না। আজ চাঁদ উঠেছে। এখন একেবারে মাথার ওপর। আলোয় ভেসে যাচ্ছে চারপাশ। বিমানদাদুর গাল বেয়ে জলের ধারা নেমেছে। চাঁদের আলোয় চিকচিক করছে হিরের দানার মতো। রমাদি এসে বসেছেন, বিমানদাদুর ওপাশে। মাঝে-মাঝে গলা দিচ্ছেন। তখন যেন আরও সুন্দর লাগছে।

প্রশান্তদা আজ আর আসবেন না। একেবারে কাল সকালে গাড়ি নিয়ে আসবেন। বিমানদাদু গান থামিয়ে বললেন, "এবার সব শুয়ে পড়ো। কাল সকালে ট্রেন ধরতে হবে।"

পলাশ আজ শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল। খুব কষ্ট গেছে সারাদিন। বিমানদাদু একা-একা বসে রইলেন বাইরের রকে। এমন চাঁদের আলো ছেড়ে ঘুমোতে আছে ! আর দু-একদিনের মধ্যে চাঁদ পূর্ণ হবে। বারান্দার থামে ঠেসান দিয়ে বিমানদাদু বসেই রইলেন। রাত এগিয়ে চলল তরতর করে ভোরের দিকে। একবার তাঁর মনে হল, তিনি একা নন। আরও একজন কেউ তাঁর পাশে এসে বসেছে। তাই তিনি চেয়েছিলেন। শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, "একদম ভেবো না, আমরা আছি। তোমার ছেলে তোমার চেয়েও বড় হবে।"

সকাল আটটা। সবাই গাড়িতে উঠে পড়েছে। অক্ষয়কাকা এসেছেন। তাঁর চোখ ছলছল করছে। বাবা যে ঘরে বসে লেখাপড়া করতেন, শেষবারের মতো পলাশ সেই ঘরে ঢুকল। মেঝেতে টেবিলের পায়ার দাগ। যে জায়গায় ছবিটা ছিল সেই জায়গায় অল্প-অল্প ঝুল বাতাসে কাঁপছে। মেঝেতে একটা কী চকচক করছে। পেতলের কানখুসকি। বাবার জিনিস। পলাশ তুলে পকেটে রাখল।

বিমানদাদু পলাশের হাত ধরে ঘরের বাইরে নিয়ে এলেন। কত কী হয়ে গেছে এই বাড়িতে। একে-একে পলাশের সব মনে পড়ছে। দু'জনে গাড়িতে গিয়ে উঠতেই দুর্গা বলে গাড়ি ছেড়ে দিল। অক্ষয়কাকা হাত নাড়তে লাগলেন। মা একেবারে জানলার ধারে। মুখে ছেলেমানুষের মতো হাসি। পলাশ পেছনে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। ওই বাড়ি, রাস্তা, অক্ষয়কাকা, দোকান, কৃষ্ণচূড়া, শীতলা-মন্দির।

চারটের সময় রোদ একটু পড়তে শ্যামলী পলাশদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। দরজায় এই বড় একটা তালা ঝুলছে। রাস্তার একটা কুকুর দরজা আগলে শুয়ে আছে। পলাশের বন্ধু। আজ আর খাওয়া জোটেনি। ঘুমিয়ে পড়েছে। কেউ কি দরজা খুলবে ! শ্যামলী অবাক হয়ে তালাটার দিকে তাকিয়ে আছে। বিশ্বাস হচ্ছে না তার। দু'-তিনবার ডাকল, "পলাশ, পলাশ।" সাড়া নেই। অক্ষয়কাকা দোকান থেকে নেমে এলেন, "ওরা তো চলে গেছে মা !"

"কোথায় কাকু ?"

"এলাহাবাদ।"

"কবে ?"

"আজ সকালে।"

"কবে আসবে কাকু ?"

"আর আসবে না মা।"

শ্যামলী অবাক চোখে অক্ষয়কাকুর দিকে তাকিয়ে রইল। জল এসেছে চোখে।

"তোমার কি চিকেন পক্স হয়েছিল ?"

শ্যামলী ঘাড় নাড়ল।

"পড়ন্ত বেলার রোদ লাগিও না মা। এখনও তুমি খুব দুর্বল।"

শ্যামলী কান্না-মেশানো গলায় বললে, "তাই তো আমি আসতে পারিনি কাকু।"

অক্ষয়কাকু শ্যামলীর মাথাটা বুকে টেনে নিলেন। কুকুরটা মুখ তুলে একবার দেখল। তারপর শুয়ে পড়ল আবার।

পলাশের ট্রেন তখন অনেক দূর চলে গেছে। পাহাড়ের এলাকা শুরু হয়ে গেছে। পলাশ পাহাড় দেখছে। জঙ্গলের পর জঙ্গল ছুটে এসে পেছনে হারিয়ে যাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছে না, বন্ধ দরজা, এত বড় একটা তালা, একটি মেয়ের চোখের জল। পলাশ ভুলে গেছে, আজ তার প্রিয় বন্ধু ভুলোর খাওয়া হল না।